নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমান্বিত জীবনের শেষ একশ দিনের অসিয়্যতসমূহ

وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم في المائة يوم الأخيرة من حياته الشريفة

<বাঙালি - Bengal - بنغالي >

সালেহ ইবন আব্দুর রহমান আল-হুসাইন

আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ আল-হাজ

অনুবাদক: আব্দুল্লাহ আল মামুন আল-আযহারী

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم في المائة يوم الأخيرة من حياته الشريفة

صالح بن عبد الرحمن الحصين

عبد العزيز بن عبد الله الحاج

ﮋﮊ

ترجمة: عبد الله المأمون الأزهري

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম সর্বোত্তম নবী ও রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাহাবীদের ওপর বর্ষিত হোক।

আল্লাহর সাহায্যে এ বইটিতে আল্লাহর নির্বাচিত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ একশ দিনের অসিয়্যতসমূহ একত্রিত করেছি। দশম হিজরীর যুলকাদ মাসের পঁচিশ তারিখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা দেওয়ার পর থেকে একাদশ হিজরীর বারোই রবি‘উল আউয়াল তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এ সময় ব্যপ্ত। নিম্নোক্ত মাপকাঠিতে আমরা এ সব অসিয়্যত নির্ধারণ করেছি:

১- সরাসরি অসিয়্যত শব্দটি উল্লেখ থাকলে যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

«اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا».

“তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কল্যাণের অসিয়্যত করো (উপদেশ দাও”।[1]

অথবা বাক্যের ধরণ অনুযায়ী বিষয়টি সম্পর্কে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব বুঝালে, যেমন বিষয়টি বারবার উল্লেখ করে গুরুত্ব প্রদান করা। উদাহরণত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ».

“সালাত, সালাত (অর্থাৎ সালাত ঠিকভাবে আদায় করবে)”।[2]

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ১১৬৩। তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৮৫১।

2 আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৫৬; মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৫৮৫। শু‘আইব আরনাউত

২- অসিয়্যতটি প্রদানের দিন স্পষ্ট উল্লেখ থাকা বা অসিয়্যতটিতে এমন ইঙ্গিত থাকা যা প্রমাণ করে এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ জীবনে অসিয়্যত করেছেন।

৩- উম্মতের কিছু লোকের মধ্যে যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সঙ্ঘটিত হচ্ছে সেগুলোকে অসিয়্যতের দৃষ্টিকোণে পর্যবেক্ষণ করে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের মধ্যে এ ধরণের ভুল-ত্রুটির আশঙ্কা করেছেন বলে তিনি তাঁর শেষ জীবনে এগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা সাধারণত অসিয়্যতকারী এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অসিয়্যত করেন যেগুলোতে পতিত হওয়ার বা যেগুলো চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এসব মানদণ্ডে নিম্নোক্ত অসিয়্যতসমূহ যথার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে:

১- সালাত আদায়ের অসিয়্যত।

২- কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার অসিয়্যত।

৩- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার পরিজন (আহলে বাইত) এর ব্যাপারে অসিয়্যত।

৪ -আনসারদের ব্যাপারে অসিয়্যত।

৫ -কর্তৃত্বের অধিকারীর আনুগত্য করার অসিয়্যত।

৬- মুসলিমের মান-সম্মান রক্ষার অসিয়্যত।

৭- নারীদের সম্পর্কে অসিয়্যত।

৮- দাস-দাসীর অধিকার প্রদানের অসিয়্যত।

৯- আমানত আদায়ের অসিয়্যত।

১০- ইয়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত করে দেওয়ার অসিয়্যত।

হাদীসটিকে (মতনের বিবেচনায়) সহীহ বলেছেন, আর এ হাদীসের সনদটিকে হাসান বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

১১- শির্ক ও এর যাবতীয় পন্থা থেকে সতর্ক করা।

১২- বিদ‘আত ও নতুনত্ব থেকে হুশিয়ারী।

১৩- গোলযোগ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে সতর্কীকরণ।

১৪- সুদ থেকে হুশিয়ারী।

১৫- দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর অসিয়্যত।

আমি এ সব অসিয়্যত আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করেছি। যেসব হাদীসের ওপর ভিত্তি করে অসিয়্যত ধর্তব্য হয়েছে সেগুলো আগে উল্লেখ করেছি। অতঃপর এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সব যেমন কুরআন ও সুন্নাহর দলীল, ইসলামের কিছু বিজ্ঞ পণ্ডিত মুফাসসির ও মুহাদ্দিসের অভিমত উল্লেখ করেছি। আমরা সাধ্যমত নাতিদীর্ঘ করার চেষ্টা করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো বইটি সকলের জন্য সহজবোধ্য ও স্পষ্ট ভাষায় গ্রহণযোগ্য হোক।

উম্মতের জন্য আমরা যেসব নসীহত ও উপকার কামনা করছি সে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি। তিনিই নানা জাতির একমাত্র হিদায়াতদাতা এবং উদ্দেশ্য সফলে তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর আল্লাহর সালাত বর্ষিত হোক।

লেখকদ্বয়

প্রথম অসিয়্যত: সালাত আদায়ের অসিয়্যত

১- ইমাম আহমদ রহ. তার মুসনাদে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে এবং ইমাম হাকিম ও ইবন হিব্বান রহ. আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন,

كَانَ آخِرُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ، وَمَا كَانَ يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ: «الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তিম মুহূর্তে তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছিলো এবং তাঁর মুখের ভাষায় এ অসিয়্যত ছিল যে, “সালাত, সালাত (অর্থাৎ সালাত পড়বে) এবং তোমাদের দাস-দাসীর ব্যাপারে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে (অর্থাৎ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে)”।[1]

২- আবু দাউদ, আহমদ ও ইবন মাজাহ রহ. আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সর্বশেষ কথা ছিল, সালাত, সালাত (অর্থাৎ সালাত ঠিকভাবে আদায় করবে), এবং তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে (অর্থাৎ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে)”।[2]

---

[1] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৬৬৮৪, শু‘আইব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৬৬০৫, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন; আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৫৬; মুসতাদরাক হাকিম, হাদীস নং ৪৩৮৮।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৫৬; মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৫৮৫, শু‘আইব আরনাউত হাদীসটিকে (মতনের বিবেচনায়) সহীহ বলেছেন, আর এ হাদীসের সনদটিকে হাসান বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৩- ইমাম আহমদ, তিরমিযী, হাকেম ও ইবন হিব্বান রহ. আবু উমামা আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

«حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنِي بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا، أَلَا لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنِي بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا، أَلَا لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنِي بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا». فَقَامَ رَجُلٌ طَوِيلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، فَمَا الَّذِي نَفْعَلُ؟ فَقَالَ: «اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَحُجُّوا بَيْتَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاتَكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ، وفي رواية، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ عز وجل».

"আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হজ পালন করেছি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিদায় হজের ভাষণে) আল্লাহর হামদ ও সানা করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা সম্ভবত এ বছরের পরে (আগামী বছর) আমাকে আর দেখতে পাবে না। তোমরা সম্ভবত এ বছরের পরে (আগামী বছর) আমাকে আর দেখতে পাবে না। তোমরা সম্ভবত এ বছরের পরে (আগামী বছর) আমাকে আর দেখতে পাবে না। এ কথা শুনে ইয়ামেনের আযদ গোত্রের এক লম্বা লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমরা তাহলে কী করব? মুসনাদে আহমদের অন্য বর্ণনায় আছে, তাহলে আমাদের থেকে আপনি কী অঙ্গিকার চাচ্ছেন? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, তোমাদের রমযান মাসের সাওম পালন করবে, তোমাদের ঘরের (বাইতুল্লাহর) হজ পালন করবে, সন্তুষ্টচিত্তে যাকাত আদায় করবে এবং তোমাদের মধ্যে যিনি আমির হবেন তার অনুগত্য করবে, তাহলে তোমরা তোমাদের মহান রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে"।[1]

---

[1] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২২২৬০, শুয়াইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসটি সহীহ; কিন্তু এ সনদটি দ'য়ীফ; কেননা এ সনদে ফারাজ ইবন ফাদালা –আততানুখী আশশামী- রয়েছেন,

ইসলামে সালাতের মর্যাদা:

সালাত দীনের স্তম্ভ। এটি ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে দ্বিতীয় রুকন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাক্ষ্যদানের পরে সালাতের স্থান। এককথায় ইসলামের আমলসমূহের মধ্যে সালাত অন্যতম শ্রেষ্ঠ রুকন এবং দীন ইসলামের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারিক শি'আর তথা নিদর্শন। শামসুল আইম্মাহ সারখাসী আল-হানাফী রহ. বলেন, "যেহেতু আল্লাহর ওপর ঈমানের পরেই সালাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ রুকন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [التوبة: ١١]

"অতএব, যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ».

"আর সালাত দীনের স্তম্ভ"।[1]

অতএব, কেউ তাবু টানাতে চাইলে তাকে শুরুতেই মূলস্তম্ভ স্থাপন করতে হবে। সালাত দীনের সর্বোচ্চ নিদর্শন ও আলামত। প্রত্যেক নবীর শরী'আতেই সালাতের বিধান ছিলো।... ইমাম সারখাসী রহ. আরো বলেন, আমি আমার শাইখ উস্তাদ শামসুল আইম্মাহ আল-হালওয়ানী রহ. কে বলতে শুনেছি, তিনি আল্লাহর বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন,

---

যিনি দয়ীফ। তিরমিযী, হাদীস নং ৬১৬, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[1] শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী, হাদীস নং ২৫৫০। ইবন হাজার আসকালানী রহ. 'তালখীসুল হাবীর' এ বলেন, "ইমাম নাওয়াবী রহ. 'তানকীহ' কিতাবে হাদীসটিকে মুনকার ও বাতিল বলেছেন। তবে তিনি ইমাম নাওয়াবীর কথাকে রদ করে বলেছেন, এ হাদীসের সনদে শুধু দুর্বলতা ও ইনকিতা' আছে, তবে বাতিল নয়। দেখুন, তালখীসুল হাবীর: ১/৩০৮। আলবানী রহ. হাদীসটিকে দ'য়ীফ বলেছেন। দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসুদ-দয়ীফা: ১৪/১০৬৬।

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ١٤﴾ [طه: ١٤]

“এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো”। [সূরা তা-হা, আয়াত: ১৪] অর্থাৎ আমি প্রত্যেক প্রেরিত নবীর ওপর অবতীর্ণ কিতাবে সালাতের কথা উল্লেখ করেছি। তিনি আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাখ্যায় আরো বলেছেন,

﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ٤٣﴾ [المدثر: ٤٢، ٤٣]

“কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাল? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না”। [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪২-৪৩]। এ আয়াত থেকে সালাতের তাগীদ সাব্যস্ত হচ্ছে। যখনই জাহান্নামে যাওয়ার কারণে হিসেবে সালাত পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে তখনই বুঝা গেল যে তা ঈমানের দ্বিতীয়টি। কারণ, শাব্দিক অর্থে ‘মুসল্লী’ তো বলা হয় তাকে, যিনি ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথমটির পরে থাকে।[1]

ইসলামে সালাতের অপরিসীম গুরুত্ব ও তাৎপর্য আরো স্পষ্ট প্রমাণিত হয় এভাবে যে, একমাত্র জ্ঞানশূন্য বা হায়েজ ও নিফাস ব্যতীত কোনো মুসলিমের থেকে কোনো অবস্থাতেই সালাত রহিত হয় না। অসুস্থ ব্যক্তির ওপরও সাধ্যানুযায়ী সালাত আদায় করা ফরয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমরান ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেছেন,

«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

“দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তাতে সমর্থ না হলে বসে, যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে কাত হয়ে শুয়ে”।[2]

এমনিভাবে নিরাপদ ও ভয়-ভীতি উভয় অবস্থাতেই সালাত আদায় করা ফরয। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]

---

[1] মাবসূত, সুরুখসী, দারুল মা‘আরিফ, বৈরুত, প্রকাশকাল, ১৯৯৩ইং, পৃ. ১/৪।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১১৭।

“কিন্তু যদি তোমরা ভয় কর, তবে হেঁটে কিংবা আরোহণ করে (আদায় করে নাও)”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৯] অর্থাৎ তোমাদের জন্য যেভাবে সালাত আদায় করা সহজ হয় সেভাবে সালাত আদায় করো।

সময়মত সালাত আদায় করাও ফরয। এমনকি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবিলারত থাকলেও ওয়াক্তমত সালাত আদায় করতে হবে; যদিও এতে নিজের চলা বা দৌড়ানো বা শত্রুকে অস্ত্রদ্বারা আঘাত করতে অসুবিধে হয় তবুও সালাত বাদ দেওয়া যাবে না।

সালাতে রয়েছে আল্লাহর সাক্ষাতপ্রত্যাশীর সাহচর্য, আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দার প্রশান্তি ও আরাম, আল্লাহওয়ালা মুত্তাকি বান্দার সাহায্য ও সহযোগিতা। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ٤٥﴾ [البقرة: ٤٥]

“আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৫]

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সালাতের ব্যাপারে স্পষ্ট গাফলাতি ও অবহেলা দেখা দিয়েছে। এটি প্রতিটি জীবন্ত আত্মাই লক্ষ্য করে। বর্তমান মুসলিমের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে ও তাদের অবস্থা দেখলে দুঃখ অনুশোচনায় হৃদয় ভরাক্রান্ত হয়ে যায়। তাদের কেউ কেউ এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতটি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে, আবার কেউ নিয়মিত না পড়ে অলসতা করছে, আবার কেউ সালাতের শর্ত ও ওয়াক্তমত আদায় না করে ত্রুটি বিচ্যুতি করছে। অন্যদিকে একাগ্রচিত্ততার সাথে সালাত আদায় না করার ত্রুটি অনেকের মধ্যেই লক্ষণীয়।

মুসলিমরা যদি যথাযথভাবে সালাত আদায় করতো, উত্তমরূপে সালাত কায়েম করতো তাহলে সালাত তাদের পারিপার্শ্বিক ও নৈতিক অবস্থার সংশোধন করার

উপায় হতো। কেননা সালাত মানুষকে অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। চিরন্তন সত্যবাদী মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٤٥﴾ [العنكبوت: ٤٥]

“এবং সালাত কায়েম কর। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন যা তোমরা করো”। [সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ৪৫]

বর্তমানে অনেক মুসলিমের দিকে তাকালে দেখা যায় যারা অনেকেই সালাত আদায় করে; কিন্তু তাদের মধ্যে সালাতের কোনো নিদর্শন ও প্রভাব নেই। এর মূল কারণ হলো অনেক মুসল্লীই শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক নড়াচড়া ও উঠা বসা ইত্যাদি করে সালাত আদায় করছে। তারা সালাতের প্রকৃতরূপ ও খুশু‘র (একাগ্রচিত্ততা) সাথে তা আদায় করছে না। ফলে সালাতও তাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল, পবিত্রতা ও সংশোধন করছে না।

(আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, তিনি উত্তম সাহায্যকারী)

সালাতের ব্যাপারে উদাসীনতা স্বত্বেও এর গুরুত্ব অপরিসীম হওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তিম মুহূর্তে উম্মতকে সালাতের অসিয়্যত করে গেছেন। জীবনের শেষ সময় তাঁর যখন শ্বাস কষ্ট হচ্ছিলো তখন তাঁর শেষ কথা ছিলো সালাত! সালাত! হে আমার উম্মত সময়মত সালাত আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক, তিনি উম্মতের জন্য কতই না সুন্দর নসীহত করেছেন! আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

সালাতের হুকুম:

ইবন রুশদ মালেকী রহ. বলেন, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সালাত ফরয হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। এটা এতোই স্পষ্ট ও জ্ঞাতব্য বিষয় যে, এ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।[1]

সালাতের ওয়াক্তসমূহ:

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النساء : ١٠٣]

“অতপর যখন নিশ্চিন্ত হবে তখন সালাত (পূর্বের নিয়মে) কায়েম করবে। নিশ্চয় সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩]

শাওকানী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সালাত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা। যেমন, বলা হয়, وقَّته فهو موقوت وقَّته فهو مؤقَّت অর্থাৎ আল্লাহ বান্দাহর ওপর সালাত ফরয করেছেন এবং তা নির্ধারিত সময়ে আদায় করা ফরয করেছেন। অতএব, শর‘ঈ ওযর যেমন, ঘুম বা ভুলে যাওয়া বা এরূপ অন্য কোনো কারণ ছাড়া কারো জন্য এ সময় ব্যতীত অন্য সময়ে সালাত আদায় করা বৈধ নয়।

সালাত নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে আদায় না করে এর নির্ধারিত সময়ে আদায় করা ফরয হওয়ার আরেকটি দলীল হলো, এটি ভয়-ভীতির সময়েও বান্দাহর ওপর থেকে রহিত হয় না। আল্লাহ মুসলিমের ওপর ভয়-ভীতি ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলারত অবস্থায়ও নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করা ফরয করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ ٢٣٩﴾ [البقرة: ٢٣٨، ٢٣٩]

---

[1] বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবন রুশদ আল-হাফীদ আল-মালেকী, ১/৯৬।

“তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত করো এবং আল্লাহর জন্য বিনীত হয়ে দাঁড়াও। কিন্তু যদি তোমরা ভয় করো, তবে হেঁটে কিংবা আরোহণ করে (আদায় করে নাও)”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৮-২৩৯]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হাদীসে বলেছেন,

«صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا».

“তুমি উত্তম সময়ে সালাত আদায় করে নেবে”।[1]

অতএব, প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সময়মত আদায় করা। ঘুম বা ভুলে যাওয়া ইত্যাদি শর‘ঈ ওযর ব্যতীত বিলম্বে সালাত আদায় করা কবীরা গুনাহ। বরং অনেক আলেমের মতে এভাবে বিলম্বে সালাত আদায়কারী ও সালাত তরককারীর একই হুকুম।

তাই হে মুসলিম ভাই, বিলম্বে সালাত আদায় থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। আপনি আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ুন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥﴾ [الماعون: ٤، ٥]

“অতএব, সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা নিজেদের সালাতে অমনোযোগী”। [সূরা আল-মা‘ঊন, আয়াত: ৪-৫]

ইমাম কুরত্বুবী রহ. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, “যারা বিলম্বে সালাত আদায় করে তাদের জন্য দুর্ভোগ”।[2]

সালাতের আদবসমূহ:

১- ইখলাস: লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৪৮।

[2] তাফসীরে কুরতবী ২০/২১১।

﴿يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلٗا ١٤٢﴾ [النساء : ١٤٢]

“তারা লোকদেরকে (সালাত) দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪২]

২- সালাতে সক্রিয় থাকা ও সালাত আদায় করতে সক্ষম হওয়াতে খুশি হওয়া। কেননা সালাতে অলসতা ও সালাতকে বোঝা মনে করা মুনাফিকের আলামত। আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন,

﴿وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ﴾ [النساء : ١٤٢]

“আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪২]

৩- সালাতের জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা:

ক- সুন্দর কাপড় পরিধান করা।

খ- ফরয সালাতের পূর্বে ও পরে শরী‘আত অনুমোদিত নফল সালাত আদায় করা।

গ- যেসব কারণে সালাতে মস্তিষ্ক বাজে চিন্তা করে তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। যেমন, খাবার সামনে রেখে সালাত আদায় করা বা অতি গরম বা অতি ঠাণ্ডায় সালাত আদায় করা।

৪- পুরুষের জন্য জামা‘আতে সালাত আদায় করা। সুস্থ ও মুকিম পুরুষের ওপর জামা‘আতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। জামা‘আতে সালাত আদায়ের দলীল হলো এক অন্ধ সাহাবী (আব্দুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, তার বাড়ি মসজিদ থেকে দূরে এবং এমন কোনো লোক নেই যে তাকে মসজিদে নিয়ে আসবে। তাই তিনি বাড়িতে সালাত আদায় করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

«هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ».

"তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ (আমি আযান শুনতে পাই)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাহলে তুমি মসজিদে আসবে"।[1]

যারা জামা'আতে সালাত আদায় থেকে বিরত থাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাড়ি ঘর আগুনে জ্বালিয়ে দিতে ইচ্ছা পোষণ করেছেন। গৃহে নারী ও শিশু থাকায় তাদের হেফাযতের কারণে তিনি এ কাজ করেন নি। মূলত এটি ছিলো শর'ঈ ওযর।

জামা'আতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে যখন দেখি ভয়-ভীতির সময়ও জামা'আতে সালাত আদায় করা রহিত হয় না। আল্লাহ ভীতি ও যুদ্ধের সময়ও জামা'আতে সালাত আদায় করার বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَيَمِيلُونَ عَلَيۡكُم مَّيۡلَةٗ وَٰحِدَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذٗى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ وَخُذُواْ حِذۡرَكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ١٠٢﴾ [النساء : ١٠٢]

"আর যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন, অতঃপর তাদের জন্য সালাত কায়েম করবেন, তখন যেন তাদের মধ্য থেকে একদল আপনার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা তাদের অস্ত্র ধারণ করে। এরপর যখন সিজদা করে ফেলবে, তখন তারা যেন আপনাদের পেছনে অবস্থান নেয়। আর অপর একটি দল যারা সালাত আদায় করেনি তারা যেন আপনার সাথে এসে সালাত আদায় করে এবং তারা যেন তাদের সতর্কতা অবলম্বন ও অস্ত্র ধারণ করে। কাফিররা

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫৩।

কামনা করে যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাব-পত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও তাহলে তারা তোমাদের উপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কোন কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও তাহলে অস্ত্র রেখে দেওয়াতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। আর তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছেন লাঞ্ছনা-দায়ক আযাব”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০২]

এ আদেশ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাগণেদের কাছে স্থায়ীরূপে স্থির হয়েছিল; এমনকি তারা জামা‘আত তরককারীকে মুনাফিক মনে করতেন। কেউ অসুস্থ হলেও কষ্ট করে জামা‘আতে উপস্থিত হতেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কথা শুনুন, আব্দুল্লাহ ইবন মাস’উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ».

“যে ব্যক্তি আগামীকাল কিয়ামতের দিন মুসলিম হিসাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পেতে আনন্দবোধ করে সে যেন ঐসব সালাতের রক্ষণাবেক্ষণ করে যেসব সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের নবীর জন্য হিদায়াতের পন্থা-পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেছেন। আর এসব সালাতও হেদায়াতের পন্থা-পদ্ধতি। যেমন এই ব্যক্তি সালাতের জামা‘আতে উপস্থিত না হয়ে বাড়িতে সালাত পড়ে থাকে, অনুরূপ তোমরাও যদি তোমাদের বাড়িতে সালাত পড়ো তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত বা পন্থা-পদ্ধতি পরিত্যাগ করলে। আর তোমরা যদি এভাবে তোমাদের নবীর সুন্নাত বা

পদ্ধতি পরিত্যাগ করো তাহলে অবশ্যই পথ হারিয়ে ফেলবে। ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস’উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা মনে করতাম সর্বজনবিদিত মুনাফিক ব্যতীত কেউ-ই জামা‘আতে সালাত পড়া ছেড়ে দেয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এমন ব্যক্তি জামা‘আতে উপস্থিত হতো যাকে দু’জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে এসে সালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো”।[1]

৫- সালাতে করণীয় কাজে ও পঠিত সূরা ও দো‘আর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুসন্ধান করা। যাতে সালাতে মুসলিমের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীর পূর্ণ অনুসরণ হয়,

«وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

“যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ ঠিক সেভাবে সালাত আদায় করো”।[2]

৬- সালাতে খুশু‘ (একনিষ্ঠা) ও মনের একাগ্রচিত্ততা বজায় রাখা। এটি সালাতের অন্যতম আদব; বরং এটি সালাতের মূল ও রুহ। এর অন্তর্নিহিত কারণ হলো, এসব উদ্দেশ্যেই শরী‘আত সালাতের বিধান বিধিবদ্ধ করেছেন। যেমন ব্যক্তির তাকওয়া ও অন্যান্য উত্তম আখলাক অর্জন এবং অসচ্চরিত্র ও সমস্ত অশ্লীল ও অন্যায় থেকে বিরত থাকা; বরং বান্দাহর একনিষ্ঠতা ও মনের একাগ্রচিত্ততা অনুযায়ী সালাতের সাওয়াব প্রত্যাশা করা হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢﴾ [المؤمنون : ١، ٢]

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫৪।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০০৮।

“অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজদের সালাতে বিনয়াবনত”। হবে। [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১-২]

আম্মার ইবন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمْنُهَا سُبْعُهَا سُدْسُهَا خُمْسُهَا رُبْعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا».

“এমন অনেক লোক আছে যারা সালাত আদায় করে, কিন্তু তাদের সালাত পরিপূর্ণভাবে না হওয়ায় তারা পূর্ণ সাওয়াব প্রাপ্ত হয় না; বরং তাদের কেউ দশভাগের একভাগ, নয়ভাগের একভাগ, আটভাগের একভাগ, সাতভাগের একভাগ, ছয়ভাগের একভাগ, পাচঁভাগের একভাগ, চারভাগের একভাগ, তিনভাগের একভাগ বা অর্ধেক সাওয়াব প্রাপ্ত হয়ে থাকে”।[1]

হাদীসে এসেছে, দীন থেকে সর্বপ্রথম খুশু‘ (একনিষ্ঠতা) চলে যাবে। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْخُشُوعُ حَتَّى لَا تَرَى فِيهَا خَاشِعًا».

“এ উম্মতের থেকে সর্বপ্রথম খুশু‘ (একনিষ্ঠতা) উঠিয়ে নেওয়া হবে; এমনকি তুমি কাউকে বিনয়াবনত পাবে না”।[2]

উবাদা ইবন সামিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا».

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৯৬, আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সুনান আল-কুবরা লিলবাইহাকী, হাদীস নং ৬১৬; তাবরানী ও তাহহাভী।

[2] হাইসামী রহ. বলেন, হাদীসটি ইমাম তাবরানী তার মু‘জাম আল-কাবীরে বর্ণনা করেছেন। সনদটি হাসান। মাজমাউয-যাওয়ায়েদ, ২/১৩৬।

“তুমি মসজিদে প্রবেশ করেও হয়ত একজনকেও বিনয়াবনত দেখতে পাবে না”।[1]

প্রকৃত বিনয় দু’টি জিনিসের দ্বারা গঠিত হয়। তাহলো:

প্রথম অংশ বাহ্যিক বিনয়: সালাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ধীর-স্থিরভাবে রাখা, শান্ত-শিষ্টভাবে সালাত আদায় করা এবং এদিক ওদিক না তাকানো।

দ্বিতীয় অংশ আভ্যন্তরীণ বিনয়: একাগ্রচিত্তে এমনাভাবে সালাত আদায় করা যেন মুসল্লি সালাতে পঠিত ও কৃত সব কথা ও কাজ অনুভব করতে পারে। এতে সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই লাভবান হবে।

এছাড়া কিছু উপাদান ও কারণ রয়েছে যা সালাত খুশু‘ বজায় রাখতে সাহায্য করে। নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণী এসব উপাদান ও কারণসমূহ একত্রিত করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩﴾ [العنكبوت: ٦٩]

“আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন”। [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৬৯]

সালাতে একনিষ্ঠতা ও বিনয়ের উপকরণ ও উপায়সমূহ হলো:

ক- উত্তমরূপে ও পরিপূর্ণভাবে সালাতের প্রস্তুতি নেওয়া। যেমন, পরিপূর্ণভাবে অযু করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা এবং সালাতের উপযোগী সুন্দর জায়গা নির্বাচন করা।

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৫৩, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। মুসতাদরাক হাকিম, হাদীস নং ৩৩৮। হাকিম হাদীসটিকে বাসরীদের হাদীসের মধ্যে সহীহ হাদীস বলেছেন। ইমাম যাহাবী হাদীসের সনদটিকে সহীহ বলেছেন।

খ- আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানো ও তাঁর সাথে মুনাজাতের অনুভূতি অনুভব করা। কেননা সালাতে মুসল্লী তাঁর মালিক আল্লাহ তা'আলার সামনে দণ্ডায়মান হয় এবং তাঁর সাথে গোপনে আলাপচারী করে।

গ- অন্তরের একাগ্রতা বজায় রাখার যথাযথ চেষ্টা করা।

ঘ- আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাওয়া (আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম পড়া)।

ঙ- পঠিত কুরআনের আয়াত ও দো'আর অর্থ বুঝার চেষ্টা করা।

চ- সালাতে চড়াচড়া এবং এর ধরণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। সালাতে এভাবে নড়াচড়া কীভাবে নিজেকে আল্লাহর সামনে অবনত ও বিনয়ী করা হয় তা চিন্তা-ভাবনা করা।

ছ- তারতীল তথা ধীর-স্থির ও সুন্দর আওয়াজে কিরাত পড়া।

জ- কিরাআত, দো'আ ও যিকরের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহণ করে বৈচিত্র নিয়ে আসা। অর্থাৎ সবসময় একই আয়াত বা সূরা, সবসময় একই দো'আ ও যিকির না করে অনুমোদিত বিভিন্ন দো'আ ও যিকর পাঠ করা।

ঝ- সালাতের আগের ও পরের সুন্নাতসমূহ নিয়মিত আদায় করা।

ঞ- সাজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।

দ্বিতীয় অসিয়্যত: কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা

১– ইমাম মুসলিম রহ. তার সহীহ গ্রন্থে জা'ফর আস-সাদিক থেকে, তিনি তার পিতা মুহাম্মাদ ইবন বাকের থেকে, তিনি জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে নামিরায় তাঁর দীর্ঘ খুৎবায় বলেছেন,

«وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ».

“আমি তোমাদের মাঝে যে জিনিস রেখে যাচ্ছি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে, তখন তোমরা কি বলবে? তারা বললো, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছেন, আপনার দায়িত্ব আদায় করেছেন এবং নসীহত বা কল্যাণ কামণা করেছেন”।[1]

২- ইমাম বায়হাকী ও হাকিম রহ. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا: كِتَابُ اللهِ , وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ».

“আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ (হাদীস)”।[2]

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[2] সুনান বাইহাকী, হাদীস নং ২০৩৩৬; মুসতাদরাক হাকিম, হাদীস নং ৩১৮। ইমাম হাকিম রহ. বলেন, 'ইমাম বুখারী ইকরামা রহ.-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, এমনিভাবে ইমাম মুসলিম আবু উয়াইস ও অন্যান্য রাবীগণ মুত্তাফাক আলাইহির রাবী'। ইমাম যাহাবী

৩- ইমাম বায়হাকী ও হাকিম রহ. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ».

“আমি তোমাদের জন্য দু’টি জিনিস রেখে গেলাম, তোমরা এ দুটো আঁকড়ে ধরলে পথভ্রষ্ট হবে না। তাহলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত (হাদীস)। আর এ এ দুটি বস্তু কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ না তোমরা আমার সাথে হাউজে কাউসারে মিলিত হচ্ছ”।[1]

৪- মুয়াত্তা মালিকে এসেছে, তিনি বলেন, আমার কাছে এ মর্মে হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ».

“আমি তোমাদের জন্য দু’টি জিনিস রেখে গেলাম, এ দুটো আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। তাহলো: আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত (হাদীস)”।[2]

৫- ইমাম মুসলিম রহ. যায়েদ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا، بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ

রহ. বলেছেন, ‘ইমাম বুখারী ইকরামা রহ. এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন, এমনিভাবে ইমাম মুসলিম আবু উয়াইস দ্বারাও দলিল পেশ করছেন। বুখারী ও মুসলিমে এ হাদীসের আসল রয়েছে। তালখীস, হাদীস নং ৩১৮।

[1] মুসতাদরাক হাকিম; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১৯।

[2] মুয়াত্তা মালিক, কিতাবুল ক্বদর, হাদীস নং ৩, (২/৮৯৯)।

فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ" فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي» فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ قَالَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী ‘খুম’ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা শেষে ওয়াজ-নসীহত করলেন। তারপর বললেন, সাবধান, হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফিরিশতা আসবে, আর আমিও তাঁর ডাকে সাড়া দেব (আমি মরে যাবো)। আমি তোমাদের কাছে মজবুত দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন); এতে হিদায়াত এবং নূর (আলো) রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করো, একে শক্ত করে ধরে রাখো। এরপর কুরআনের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন। অতঃপর বললেন, আর আমার আহলে বাইত। আমি আহলে বাইতের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্বরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বাইতের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্বরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বাইতের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। বর্ণনাকারী হুসাইন রহ. বললেন, হে যায়েদ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইত কারা? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন? যায়েদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, তাঁর স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত; তবে আহলে বাইতে তারাই, যাদের ওপর যাকাত গ্রহণ হারাম। বর্ণনাকারী হুসাইন রহ. বললেন, এ সব লোক কারা? যায়েদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, এরা আলী, ‘আকীল, জাফর ও আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমের পরিবার-পরিজন। বর্ণনাকারী হুসাইন

রহ. বললেন, বললেন, এদের সবার জন্য কি যাকাত গ্রহণ হারাম? যায়েদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, হ্যাঁ”।[1]

ভূমিকা:

অহীর দুপ্রকার কুরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সম্পর্কে এ অসিয়্যতটি কুরআনের অনেক আয়াতে বর্ণিত অসিয়্যতের মতোই। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوۡاْ عَنۡهُ وَأَنتُمۡ تَسۡمَعُونَ٢٠﴾ [الانفال: ٢٠]

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, অথচ তোমরা শুনছ”। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا٥٩﴾ [النساء : ٥٩]

“হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর ও আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪০৮।

﴿رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةٗ مُّسۡلِمَةٗ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۝١٢٨ رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ۝١٢٩﴾ [البقرة: ١٢٨، ١٢٩]

“হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদাতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে আর তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২৮-১২৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ۝١٦٤﴾ [ال عمران: ١٦٤]

“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিলো”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝٣٤﴾

[الاحزاب : ٣٤]

“আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে, আয়াতসমূহ ও হিকমত পঠিত হয়- তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয় আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوَىٰ ۝٢ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ۝٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ۝٤﴾ [النجم: ٢، ٤]

“তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হয় নি এবং বিপথগামীও হয় নি। আর সে মনগড়া কথা বলে না। তাতো কেবল অহী, যা তার প্রতি অহীরূপে প্রেরণ করা হয়”। [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ২-৪]

অতএব, কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ (তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থন) দীন ইসলামের আকীদা ও বিধি-বিধানের মূল উৎস। এদু’টি জিনিস আঁকড়ে ধরলে মুসলিম কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। ইমাম মুনাভী ‘ফাইদুল কাদীর’ এ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

«إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ».

“আমি তোমাদের জন্য দু’টি জিনিস রেখে গেলাম, তোমরা এ দুটো আঁকড়ে ধরলে পথভ্রষ্ট হবে না। তাহলো: আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত (হাদীস)। আর এ দু’টো কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না, তোমরা এভাবে তা আঁকড়ে ধরবে যতক্ষণ না তোমরা আমার সাথে হাউজে কাউসারে মিলিত হবে”।[1]

ইমাম মুনাভী রহ. বলেন, ‘কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামের মূল উৎস, যা এড়িয়ে চলার উপায় নেই এবং এ দু’টি ব্যতীত কোনো হিদায়াতও নেই। যে ব্যক্তি এ দু’টি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে এমমাত্র সেই পাপমুক্ত হবে ও নাজাত পাবে। এ

[1] মুসতাদরাক হাকিম, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১৯।

দু'টি সত্য-মিথ্যার স্পষ্ট পার্থক্যকারী এবং সত্য ও মিথ্যার বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে এ দু'টি প্রমাণিক নিয়ন্ত্রক। অতএব, কুরআন ও সুন্নাহ দিকে ফিরে যাওয়া দীনের অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাত ও নিশ্চিত ফরয'।

কুরআন ও সুন্নাহতে রয়েছে হিদায়াত ও নূর। এ দু'টি আল্লাহর হিফাযতে সংরক্ষিত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩ ﴾ [الحجر: ٩]

"নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী"। [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯] এতে রয়েছে সব সমস্যার সমাধান, সর্বস্থান ও সর্বকালে সমস্ত সমস্যা মোকাবলায় প্রজ্ঞাময় দিক নির্দেশনা। এ দু'টি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে আছে।

সালমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে একবার বলা হলো,

«قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ «لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ».

"তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে সব কাজই শিক্ষা দেন; এমনকি পেশাব পায়খানার পদ্ধতিও! তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন পায়খানার বা পেশাবের সময় কিবলামুখী হয়ে বসতে, ডান হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা কাজ করতে, তিনটি টিলার কম দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে এবং গোবর বা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে"।[1]

আল-কুরআনের মর্যাদা:

আল-কুরআন নিজের মর্যাদা নিজে যেভাবে বর্ণনা করেছে কেউ সেভাবে কুরআনের মর্যাদা বর্ণনা করতে সক্ষম হয় নি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬২।

﴿وَلَوۡ أَنَّ قُرۡءَانٗا سُيِّرَتۡ بِهِ ٱلۡجِبَالُ أَوۡ قُطِّعَتۡ بِهِ ٱلۡأَرۡضُ أَوۡ كُلِّمَ بِهِ ٱلۡمَوۡتَىٰ﴾ [الرعد: ٣١]

“আর যদি এমন কোনো কুরআন হত, যার দ্বারা পাহাড়সমূহকে চলমান করা যেত অথবা জমিনকে টুকরো-টুকরো করা যেত অথবা তার দ্বারা মৃতকে কথা বলানো যেত (তবে সেটা এই কুরআনই হত, আর তারা ঈমান আনত না)”। [সূরা আর-রাদ, আয়াত: ৩১]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [الاسراء: ٨٢]

“আর আমরা কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮২]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿لَوۡ أَنزَلۡنَا هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ عَلَىٰ جَبَلٖ لَّرَأَيۡتَهُۥ خَٰشِعٗا مُّتَصَدِّعٗا مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ٢١﴾ [الحشر: ٢١]

“এ কুরআনকে যদি আমি পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তবে তুমি অবশ্যই তাকে দেখতে, আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ। মানুষের জন্য আমরা এ উদাহরণগুলো পেশ করি। হয়ত তারা চিন্তা-ভাবনা করবে”। [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২১]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿كِتَٰبٗا مُّتَشَٰبِهٗا مَّثَانِيَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ [الزمر: ٢٣]

“সাদৃশ্যপূর্ণ একটি কিতাব (আল কুরআন), যা বারবার আবৃত্তি করা হয়। যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের গা এতে শিহরিত হয়, তারপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়ে যায়”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ২৩]

কুরআনের মর্যাদা স্বয়ং মহান স্রষ্টা আল্লাহ বর্ণনা করার পরে তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে সম্ভবত আলী ইবন আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কুরআন সম্পর্কে বর্ণনাটি চমৎকার। তিনি বলেছেন,

«كِتَابُ اللَّهِ فيه خير مَا قَبْلَكُمْ وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحَكْمُ مَا بينكم وهو الفصل لَيْسَ بِالْهَزْلِ. هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلِقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هو الذي مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هو الذي مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».

"আল্লাহর কিতাবে রয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সংবাদ এবং তোমাদের মধ্যকার ফয়সালা। এটি চিরন্তন ফয়সালাযুক্ত কথা। এটি কোনো উপহাসের পাত্র নয়। প্রবৃত্তিকামীরা এর দ্বারা বক্র হয় না, আলেমগণ এর অপরিসীম জ্ঞান সাগরে পান করার মাধ্যমে পিপাসামুক্ত হয় না, অধিক যুক্তি খণ্ডনের মোকাবিলায় পুরাতন হয় না, এর আশ্চর্য শেষ হবার নয়। এটি এমন কিতাব কেউ অহংকার বশতঃ ত্যাগ করলে আল্লাহ তাকে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে আসেন, আর কেউ এ কিতাব ছাড়া অন্য কোথাও হিদায়াত তালাশ করলে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। এটি আল্লাহর শক্ত রশি, এটি প্রজ্ঞাময় উপদেশবাণী এবং সহজ-সঠিক পথ। কেউ এ কিতাব অনুযায়ী আমল করলে প্রতিদানপ্রাপ্ত হবে, এর দ্বারা বিচার-ফয়সালা করলে ন্যায় বিচার হবে আর কেউ এ কিতাবের দিকে আহ্বান করলে তাকে 'সিরাতুম মুসতাকীম' সহজ-সঠিক পথ দেখানো হবে"।[1]

সুন্নাহর (হাদীসের) মর্যাদা:

[1] বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১/৭; 'মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ' ৪/১৪৭২।

ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হলো সুন্নাহ। এটি আল-কুরআনের স্পষ্টকারী ও অস্পষ্ট বর্ণনার বিশদ ব্যাখ্যা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]

"এবং আপনার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে আপনি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পারেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আর যাতে তারা চিন্তা করে। [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৪৪]

আল্লাহ তা'আলা আর বলেছেন,

﴿فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النساء : ٥٩]

"অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯]

ইবন 'আতিয়্যাহ রহ. এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, '(কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁকে জিজ্ঞেস করা এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সুন্নত অনুসন্ধান করা'। ইবনুল 'আরাবী আল-মালেকী রহ. বলেন, আমাদের আলেমগণ বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর কিতাবের দিকে প্রত্যার্পণ করাও, আর যদি আল্লাহর কিতাবে উক্ত সমস্যার সমাধান পাওয়া না যায় তাহলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের দিকে প্রত্যার্পণ করাও'।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ [الحشر: ٧]

"রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও"। [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭]

﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]

"অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে"। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা উপরোক্ত আয়াতের অর্থ বুঝেছেন। মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে ইয়ামেনের শাসনকর্তা করে প্রেরণের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ».

"তোমার কাছে যখন কোনো মোকদ্দমা (বিচার) পেশ করা হবে, তখন তুমি কীভাবে তার ফয়সালা করবে? তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করবো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি আল্লাহর কিতাবে এর কোনো সমাধান (সরাসরি) না পাও? তখন মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী ফয়সালা করবো। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তুমি রাসূলের সুন্নাতে এবং আল্লাহর কিতাবে এর কোনো ফয়সালা না পাও? তখন তিনি বললেন, এমতাবস্থায় আমি চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ইজতিহাদ করবো এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ শৈথিল্য করবো না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বুকে হাত মেরে বললেন, সমস্ত প্রশংসা

আল্লাহর, যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূতকে এরূপ তাওফীক দিয়েছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন"।[1]

কুরআন ও সুন্নাহর সংরক্ষণ:

এ উম্মতের ওপর মহান আল্লাহর অপার করুনা যে, তিনি তাঁর নাযিলকৃত কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ۝٩﴾ [الحجر: ٩]

"নিশ্চয় আমরা কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাযতকারী"। [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯]

এ আয়াতের প্রত্যায়ন অনুসারে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিফা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে কুরআনকে বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত অসংখ্য পাণ্ডুলিপি ও হাফেযদের অন্তরে সংরক্ষিত থেকে একটি মাসহাফে (কুরআনে) একত্রিত করার তাওফীক দিয়েছেন। অতঃপর, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর আঠারো বছরেরও কম সময়ে আমীরুল মুমিনীন যুন-নূরাইন উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে একই হরফে ও একই কিতাবে একত্রিত করে উম্মতের মাঝে বিতরণ করার তাওফীক দিয়েছেন। ফলে অন্যান্য আসমানী কিতাব হারিয়ে যাওয়া ও পরিবর্তন হওয়ার যেরূপ সম্মুখীন হয়েছিল, কুরআনকে সে সব সমস্যা থেকে আল্লাহ মুক্ত রেখেছেন। ফলশ্রুতিতে, সমস্ত আসমানী কিতাবের মধ্যে একমাত্র আল-কুরআনই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সনদে সাব্যস্ত ও প্রমাণিত। এতে যুগ যুগ ধরে কোনো পরিবর্তন স্পর্শ করতে পারে নি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর সুন্নাতকে সংরক্ষণ ও সত্যায়ন করতে এ উম্মতের আলেমদেরকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটি অভিনব পদ্ধতিতে

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৫৯২।

সংরক্ষণের তাওফিক দিয়েছেন, যে পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত কেউ (এতো সূক্ষ্মভাবে) কোনো কিছু সংরক্ষণ করতে পারে নি। এ পদ্ধতির ফলে সহীহ, দ'য়ীফ, মারফু', মাউকুফ, মুত্তাসিল, মুনাকাতি', নাসিখ ও মানসূখের মধ্যে পার্থক্য করা সহজ হয়েছে।

বিষয়টি একদমই বর্ণনাতীত। এ পদ্ধতির সূক্ষ্মতা ও নির্ভরযোগ্যতা এতোই বেশি যে, এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ যারা মুহাদ্দিসীনদের জীবন-চরিত ও কিতাবাদি নিয়ে গবেষণা করেন তারা ছাড়া কেউ অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন না।

আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের বিশুদ্ধ উৎস (কিতাব), এসব উৎসের সংরক্ষণ ও প্রমাণের দিক থেকে তাদেরকে বর্তমান যুগের অন্যান্য ধর্মের অনুসারী থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত করেছেন। ইসলামই একমাত্র দীন যার অনুসারীদের কাছে এ দীনের নবীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর সূক্ষ্ম সীরাত, সাধারণ ও একান্ত জীবনের সব কিছুই পরিপূর্ণ ইয়াকীনের সাথে সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও জ্ঞাত। তাছাড়াও এ দীনের আনিত মূল কিতাবে যে কোনো ধরণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, হারিয়ে যাওয়া, সংযোজন বা বিয়োজন হয় নি, এ ব্যাপারে উম্মতের পূর্ণ ইয়াকীন রয়েছে।

পক্ষান্তরে, ধর্মীয় বিষয়ক ইতিহাস জ্ঞাত সবাই একথা জানেন যে, অন্যান্য ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাদের আনিত মূল কিতাব তাদের জীবদ্দশায় অনুসারীদের কাছে নিশ্চিতভাবে পৌঁছেছে একথা কেউ দাবী করতে পারবে না। এমনকি যেসব নবীর প্রতি সম্বন্ধ করা হয় যে এটি উক্ত নবীর আনিত কিতাব, তাদের সাথে কোনো ধারাবাহিক সনদও নেই; বরং তাদের কাছে এটি প্রমাণিত যে, এসব কিতাবে বিকৃতি, পরিবর্তন, মতানৈক্য, পরস্পর বৈপরিত্য এবং পশ্চাৎ ও সম্মুখ সর্বদিক থেকে হয়েছে ভুল-ভ্রান্তি, সংযোজন ও বিয়োজন অনুপ্রবেশ করেছে।

সঠিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে ব্যর্থতা:

যুগের পরিক্রমায় এ উম্মতের মধ্যে কিতাবুল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের ওপর আমল করা, এ থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হওয়া এবং এ দুটো থেকে যথাযথ হিদায়াত লাভে ব্যর্থ হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, তা উম্মতের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে সুন্নাতের ব্যাপারে বলা যায় যে, উম্মাহ সুন্নতের ওপর আমল ছেড়ে দিয়েছে এবং ভ্রান্ত চিন্তা চেতনা তাদের ওপর জয়লাভ করেছে। ফলে তারা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে আমল করা ও এ দু'টি আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে অহীর এ দুপ্রকারের (কুরআন ও হাদীস) মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। তারা ভ্রান্ত দাবী করছে যে, ইলম ও আমলের ব্যাপারে কুরআনে কারীম রাসূলের হাদীসের মুখাপেক্ষী নয়। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরণের ভ্রান্ত ধারণাকারীদের সম্পর্কে আগেই সতর্ক করেছেন। আল-মিক্বদাম ইবন মা'দীকারিব আল-কিনদী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ».

"অচিরেই কোনো ব্যক্তি তার আসনে হেলান দেওয়া অবস্থায় বসে থাকবে এবং তার সামনে আমার হাদীস থেকে বর্ণনা করা হবে, তখন সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের মাঝে মহামহিম আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। আমরা তাতে যা হালাল পাবো তাকেই হালাল মানবো এবং তাতে যা হারাম পাবো তাকেই হারাম মানবো। (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) সাবধান! নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার অনুরূপ"।[1]

---

[1] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১২; আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিরমিযী, হাদীস নং

প্রিয় মুসলিম ভাই, আপনি তাদের প্রত্যাখ্যানে নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণীসমূহ পড়ুন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾ [النساء : ٨٠]

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল"। সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ﴾ [ال عمران: ٣١]

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

আল্লাহ তা'আলা আর বলেছেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ٣٦﴾ [الاحزاب : ٣٦]

"আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে"। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৬]

আল্লাহ তা'আলা আর বলেছেন,

﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ﴾ [النحل: ٤٤]

"(আপনার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন,) যাতে আপনি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পারেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে"। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৪৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

২৪৬৪। তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন; কিন্তু আমি মূল তিরমিযীতে এ সনদে হাদীসটি হাসান গরীব পেয়েছি। -অনুবাদক।

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ٦٥﴾ [النساء : ٦٥]

“অতএব, আপনার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর আপনি যে ফয়সালা দিবেন সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

মূলকথা হলো, আল্লাহর নাযিলকৃত দু ধরণের অহী, কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি কারণে এ উম্মাহর চিন্তা-ভাবনা ও কাজে-কর্মে বিকৃতি সংঘটিত হচ্ছে। এ উম্মাহর দুর্ভাগ্য ও বিকৃতির আরো কারণ হলো, কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরে যাওয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য উৎসকে এ দুয়ের উপর প্রধান্য দেওয়া, আল্লাহ সৃষ্টিজগতের সব কিছু জ্ঞাত; কিন্তু সৃষ্টজগত তা জানে না, এ ব্যাপারে তাদের উদাসিনতা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে অহী যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো থেকে নাযিল হতো তবে অবশ্যই তাতে অনেক মতানৈক্য পাওয়া যেতো। সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের, তিনি এ দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন, আমাদের ওপর তার নি‘আমত সম্পূর্ণ করেছেন এবং ইসলামকে আমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করেছেন।

তৃতীয় অসিয়্যত:

আহলে বাইতের (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার পরিজনের) ব্যাপারে অসিয়্যত

১- ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিমে যায়েদ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا، بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ "فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي» فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ قَالَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী ‘খুম’ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা শেষে ওয়াজ-নসীহত করলেন। তারপর বললেন, সাবধান, হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফিরিশতা আসবে, আর আমিও তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের কাছে মজবুত দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন); এতে হিদায়াত এবং নূর (আলো) রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করো, একে শক্ত করে ধরে রাখো। এরপর কুরআনের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন। অতঃপর বললেন, আর হলো আমার আহলে বাইত। আর আমি আহলে বাইতের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বাইতের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে

বাইতের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। বর্ণনাকারী হুসাইন রহ. বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইত কারা, হে যায়েদ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন? যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, তাঁর স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত; তবে আহলে বাইতে তারাই, যাদের ওপর যাকাত গ্রহণ হারাম। বর্ণনাকারী হুসাইন রহ. বললেন, এ সব লোক কারা? যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, এরা আলী, 'আকীল, জা'ফর ও আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমের পরিবার-পরিজন।

বর্ণনাকারী হুসাইন রহ. বললেন, বললেন, এদের সবার জন্য যাকাত গ্রহণ হারাম? যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হ্যাঁ"।[1]

২- ইমাম বুখারী রহ. ও অন্যান্যরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ».

"মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের প্রতি তোমরা অধিক সম্মান দেখাবে"।[2]

ইমাম বুখারী ও অন্যান্যরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে আরো বর্ণনা করেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي».

"আল্লাহর কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করার চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা আমি অধিক পছন্দ করি"।[3]

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪০৮।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭১৩।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭১৩।

৩- ইমাম মুসলিম সফিয়্যাহ বিনত শাইবাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেছেন,

«خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ، مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣﴾ [الاحزاب : ٣٣]

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সকালে বের হলেন। তাঁর গায়ে ছিলো কালো চুল দ্বারা খচিত একটি পশমি চাদর। হাসান ইবন আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এলেন, তিনি তাঁকে চাদরের ভেতর ঢুকিয়ে নিলেন। অতঃপর হুসাইন ইবন আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এলেন, তাঁকেও চাদরের ভেতর ঢুকিয়ে নিলেন। অতঃপর ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এলেন, তাকেও ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললেন। অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এলেন, তাকেও চাদরের ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে"। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৩][1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার (আহলে বাইত) কারা?

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের সম্পর্কে বলেছেন,

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا٣٣ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا٣٤﴾ [الاحزاب : ٣٣، ٣٤]

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪২৪।

“আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে, আয়াতসমূহ ও হিকমত পঠিত হয়- তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয় আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৩-৩৪]

এ আয়াতসমূহ (বাহ্যিক বর্ণনা ভঙ্গি অনুসারে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আয়াতের দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য, তবে আহলে বাইত শুধু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়-স্বজনরাও এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যেমন ইতঃপূর্বে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট হয়েছে। এছাড়াও যায়েদ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আহলে বাইত কারা? তিনি উত্তরে বলেছেন,

«أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ».

“আহলে বাইত তারাই, যাদের ওপর যাকাত গ্রহণ হারাম। বর্ণনাকারী হুসাইন রহ. বললেন, এ সব লোক কারা? যায়েদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, এরা আলী, ‘আকীল, জা‘ফর ও আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমের পরিবার-পরিজন”।[1]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَخَذَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كِخْ كِخْ» لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ».

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪০৮।

“হাসান ইবন আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সদকার একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ফেলে দেওয়ার জন্য কাখ কাখ (ওয়াক ওয়াক) বললেন। তারপর বললেন, তুমি কি জানো না যে, আমরা সদকা খাই না!”।[1]

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে,

«أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ؟».

“আমাদের জন্য সদকা গ্রহণ হালাল নয়”।[2]

সহীহাইনে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে (তারা কীভাবে রাসূলের প্রতি সালাত পেশ করবে? এ প্রশ্নের জবাবে) বলেছেন,

«قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এভাবে পড়বে, “হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর স্ত্রীগণ এবং তাঁর বংশধরগণের ওপর এমনিভাবে বরকত নাযিল করুন, যেমনি আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরদের ওপর। নিশ্চয় আপনি অতি প্রশংসিত এবং অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী”।[3]

এ হাদীস অন্য একটি হাদীসকে ব্যাখ্যা করে, তা হচ্ছে,

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

---

1 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৯১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৬৯।

2 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৬৯।

3 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০৭।

“হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয় আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ এবং তাঁর বংশধরদের ওপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয় আপনি মহাপ্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী”।[1]

অতএব, প্রথম হাদীস অনুসারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘আল’ (পরিবার-পরিজন) হলো তাঁর স্ত্রীগণ ও বংশধরগণ।

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ‘আলে ইবরাহীম’ (ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর) বলতে যা বুঝানো হয়েছে ‘আলে মুহাম্মাদ ’ (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর) দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿قَالَتۡ يَٰوَيۡلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٞ وَهَٰذَا بَعۡلِي شَيۡخًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عَجِيبٞ ۝٧٢ قَالُوٓاْ أَتَعۡجَبِينَ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۖ رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٞ مَّجِيدٞ ۝٧٣﴾ [هود: ٧٢، ٧٣]

“সে বলল, হায়, কী আশ্চর্য! আমি সন্তান প্রসব করব, অথচ আমি বৃদ্ধা, আর এ আমার স্বামী, বৃদ্ধ? এটা তো অবশ্যই এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার! তারা বললো, আল্লাহর সিদ্ধান্তে আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন? হে নবী পরিবার, আপনাদের ওপর আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত। নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত সম্মানিত”। [সূরা হূদ, আয়াত: ৭২-৭৩]

এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি প্রমাণ করে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর বলতে তাঁর স্ত্রী, ইসহাক আলাইহিস সালাম ও ইয়াকূব আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত যে, আহলে বাইত

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৭০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০৬।

বা নবী পরিবার দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় হওয়ার কারণে যাদের ওপর যাকাত গ্রহণ করা হারাম তারা সবাই আহলে বাইত (নবী পরিবার)।

নবী পরিবারের মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে:

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে মিসওয়ার ইবন মাখরামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ، فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ، يَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا العَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا، وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ، عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ» فَتَرَكَ عَلِيٌّ الخِطْبَةَ».

"আবু জাহলের কন্যাকে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এ সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আপনার গোত্রের লোকজন মনে করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের খাতিরে রাগান্বিত হন না। আলী তো আবু জাহলের কন্যাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ কথা শুনে) খুতবা দিতে প্রস্তুত হলেন। (মিসওয়ার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন) যখন তিনি হামদ ও সানা পাঠ করেন, তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, আমি আবুল 'আস ইবন রাবী'র নিকট আমার মেয়েকে শাদী দিয়েছিলাম। সে আমার সাথে যা বলেছে সত্যই বলেছে। আর (শোন) ফাতিমা আমার (দেহের) টুকরা; তাঁর কোনো কষ্ট হোক তা আমি কখনও পছন্দ করি না। আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূলের মেয়ে এবং আল্লাহর চরম শত্রুর মেয়ে

একই ব্যক্তির কাছে একত্রিত হতে পারে না। (এ কথা শুনে) আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন”।[1]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,

«فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي».

“ফাতিমা আমার (দেহের) টুকরা। যে তাঁকে কষ্ট দিবে (রাগান্বিত করবে), সে যেন আমাকে কষ্ট দিল (রাগান্বিত করলো)”।[2]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,

«فاطمة بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».

“ফাতিমা আমারই একটা অংশ। যা তাকে বিষণ্ন করে, তা আমাকেও বিষণ্ন করে, তাকে যা কষ্ট দেয়, আমাকেও তা কষ্ট দেয়”।[3]

ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেছেন,

«أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ».

“আমি (ভালোবাসা ও বংশের দিক থেকে) তোমার এবং তুমি আমার”।[4]

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবন আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ব্যাপারে বলেছেন,

«إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ».

“আমার এ সন্তান নেতৃস্থানীয়। সম্ভবত তার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমের দু’টি দলের মধ্যে মীমাংসা করাবেন”।[5]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭২৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৪৯।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭১৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৪৯।

[3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৪৯।

[4] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৯৯।

[5] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭০৪।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সম্পর্কে বলেছেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ».

“হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি আপনিও তাকে ভালোবাসুন এবং যে ব্যক্তি তাকে ভালোবাসে তাকেও আপনি ভালোবাসুন”।[1]

আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সম্পর্কে বলেছেন,

﴿ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡ﴾ [الاحزاب : ٦]

“নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজদের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর। আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতাস্বরূপ”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬]

কুরআনে (ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সাথে) পারস্পারিক অভিশাপের আয়াতে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করাটাই তাদের অপরিসীম মর্যাদার প্রমাণ। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَمَنۡ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ فَقُلۡ تَعَالَوۡاْ نَدۡعُ أَبۡنَآءَنَا وَأَبۡنَآءَكُمۡ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمۡ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمۡ ثُمَّ نَبۡتَهِلۡ فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰذِبِينَ ٦١ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡقَصَصُ ٱلۡحَقُّ ٦٢﴾ [ال عمران: ٦١، ٦٢]

“অতঃপর আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর যে আপনার সাথে এ বিষয়ে ঝগড়া করে, তবে আপনি তাকে বলে দিন, এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের সন্তানদেরকে ও তোমাদের সন্তানদেরকে, আর আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে এবং আমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের নিজদেরকে, তারপর আমরা বিনীত প্রার্থনা করি, মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর লা‘নত করি। নিশ্চয় এটি সত্য বিবরণ”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৬১-৬২]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৮৪।

আহলে বাইতের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ:

নবীর পরিবার পরিজনের প্রতি ভালোবাসা ও তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা শর‘ঈ ফরয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي».

“আর আমি আহলে বাইতের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বাইতের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বাইতের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি”।[1] কেননা তাদেরকে ভালোবাসা মানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই ভালোবাসা।

আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পূর্ণ করা অত্যাবশ্যকীয় করে:

১- তাদের উঁচু সম্মান ও মর্যাদা অনুযায়ী তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা।

২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ ও সালামের সাথে তাদের জন্যও দো‘আ করা।

৩- তাদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করা, তাদের ইলমী মজলিশে বসা, তাদের থেকে ইলম গ্রহণ করা, তাদের সাথে সদাচরণ করা, তাদের মধ্যকার মতানৈক্য ও অস্পষ্ট বিষয়গুলোকে ভালো চোখে দেখা, তাদের নৈকট্য লাভের প্রত্যাশা করা এবং তাদের সাথে বিয়ে-শাদী করে বা বিয়ে-শাদী দিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলা ইত্যাদি।

৪- তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করা, তাদের ব্যাপারে সমালোচনার জবাব দেওয়া, তাদের মর্যাদা ও ভালো গুণগুলো আলোচনা করা।

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪০৮।

৫- তাদের মধ্যে অসৎ ব্যক্তিকে ভালো পরামর্শ দেওয়া, তার প্রতি ভালোবাসা ও দয়া প্রদর্শন করা এবং তাকে পবিত্র আহলে বাইতের পথে ফিরে আসার দাওয়াত দেওয়া।

ইমাম আজুররী রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতকে ভালোবাসা, তাদেরকে সম্মান দেওয়া, তাদেরকে সহ্য করা, তাদেরকে উত্তম পথে পরিচালিত করা, তাদের আচরণে কষ্ট পেলে ধৈর্য ধারণ করা এবং তাদের জন্য দো'আ করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরয।

৬- গণীমত ও ফাইয়ের থেকে তাদেরকে এক পঞ্চমাংশ দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [الانفال: ٤١]

"আর তোমরা জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু গনীমতরূপে পেয়েছ, নিশ্চয় আল্লাহর জন্যই তার এক পঞ্চমাংশ ও রাসূলের জন্য, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য"। [সূরা আল- আনফাল, আয়াত: ৪১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ ٧﴾ [الحشر: ٧]

"আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফায়[1] হিসেবে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, আত্মীয়-স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও মুসাফিরদের এটি এ জন্য যে, যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার

[1] যুদ্ধ ছাড়াই যে ধন-সম্পদ অর্জিত হয় তাকে في বলে। এটি সাধারণত বায়তুল মালে জমা রাখা হয় এবং রাসূল স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতেন। আর যুদ্ধের মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তাকে গনিমত غنيمت বলা হয়।

বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে। রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও”। [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭]

সর্ব যুগেই মুসলিমরা তাদের আকীদার কিতাবে আহলে বাইতের অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করেছেন। যেমন, হিজরী তৃতীয় শতাব্দির হানাফী মাযহাবের ইমাম ত্বহাবী রহ. রচিত ‘আকীদায়ে ত্বহাবিয়্যাহ’-তে বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী, তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ ও তাঁর পবিত্র বংশধরকে সব ধরণের নোংরা ও অপবিত্র কথাবার্তা থেকে মুক্ত রেখে উত্তম ধারণা পোষণ করবে, সে ব্যক্তি নিফাক থেকে মুক্ত থাকবে’।

হিজরী সপ্তম শতাব্দির ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিইয়্যাহ আল-হাম্বলী রহ. তাঁর ‘আকীদাতুল ওয়াসাতিয়্যাহ’ তে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ এর আকীদাহ বর্ণনায় বলেছেন, ‘তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনকে ভালোবাসেন, তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন, তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়্যাত সংরক্ষণ করেন, যেমন তিনি ‘গাদীরে খাম’-এর দিনে বলেছিলেন,

«أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي».

“আহলে বাইতের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি”।[1]

কতিপয় কুরাইশ বনী হাশিমের সাথে দুর্ব্যবহার করলে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে বলেছেন,

«والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابتي».

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪০৮।

“যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, তারা যতক্ষণ না তোমাদেরকে (বনী হাশিমকে) আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আমার আত্মীয়তার খাতিরে তারা ভালো না বাসবে ততক্ষণ তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না”।[1]

নবী পরিবার (আহলে বাইত) ও সাহাবীদের মধ্যকার সম্পর্ক:

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের ব্যাপারে তাঁর অসিয়্যত পালন করেছেন। যেমন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেছেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي».

“আল্লাহর কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করার চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা আমি অধিক পছন্দ করি”।[2]

«ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ».

“মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের প্রতি তোমরা অধিক সম্মান দেখাবে”।[3]

হাদীস দু’টি ইমাম বুখারী রহ. তার সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেছেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে আরো বলতেন,

«افتنا يا أبا الحسن».

“হে আবু হাসান, আমাদেরকে এ বিষয়ে ফতওয়া দাও”।

একবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আসরের সালাত শেষে বের হলেন। হাসান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে শিশুদের সাথে খেলাধুলা করতে দেখে তিনি তাকে কাঁধে তুলে নিলেন এবং ছন্দে ছন্দে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন,

---

[1] মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস নং ৩২২১৩; মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৭৫১৫।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭১৩।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭১৩।

بأبي شبيه بالنبي   لا شبيه بعلي

হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সদৃশ, আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে সদৃশ নয়। এ সময় আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার সাথেই ছিলেন। একথা শুনে তিনি মুসকি হাসি হাসলেন।

উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বাইতুল মালের সম্পদ বণ্টন করতে বিবরণী তৈরি করার সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতের থেকে শুরু করতেন। কেউ কেউ ধারণা করেছিলেন যে, তিনি নিজের নাম আগে অন্তর্ভুক্ত করবেন অথচ তিনি তা করেন নি; বরং তিনি বলেছেন, “আল্লাহ তাকে যে স্তরে রেখেছেন তোমরাও উমারকে সে স্তরে রেখো”।[1] তার অংশ ছিলো বনী ‘আদির অংশের সাথে। আর বনী ‘আদি কুরাইশদের অনেক পরের সিরিয়ালে ছিলো।

অন্যদিকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। তিনি ‘হাদীসুল কিসা’ এ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। প্রশ্নকারী ও ফতওয়া অনুসন্ধানীকে তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কাছে পাঠাতেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর শাহাদাতের পরে তিনি লোকজনকে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বাই‘আতের ওপর অটল থাকতে নির্দেশ দিতেন। আব্দুল্লাহ ইবন বুদাইল ইবন ওয়ারাকা আল-খুযা‘ঈ রহ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমরা কার বাই‘আত গ্রহণ করবো? তিনি বললেন, তোমরা আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বাই‘আত গ্রহণ করো এবং এতে অটল থাকো।[2]

একলোক আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বললেন, আমি আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে অপছন্দ করি। তিনি তাকে বললেন,

---

[1] তবাকাত, ইবন সা‘দ, ৩/২৯৫।

[2] মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস নং ৩৭৮৩১।

«أَبْغَضَكَ اللَّهُ , تُبْغِضُ رَجُلًا سَابِقَةٌ مِنْ سَوَابِقِهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

"আল্লাহ তোমাকে অপছন্দ করুক। তুমি কি এমন (মহান) কাউকে অপছন্দ করো, যার ইসলামে অগ্রে করা কাজসমূহের মধ্যে প্রতিটি কাজ দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা আছে সব কিছুর চেয়ে উত্তম"।[1]

এমনিভাবে আহলে বাইতের সদস্যরাও রাসূলের সাহাবীদেরকে ভালোবাসতেন, সম্মান ও মর্যাদা দিতেন। যেমন, আবু জুহাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, (আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে 'ওয়াহাব আল-খাইর' নামে ডাকতেন) তিনি বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আমাকে বললেন,

«يَا أَبَا جُحَيْفَةَ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا؟ قُلْتُ: بَلَى، وَلَمْ أَكُنْ أَرَى أَنَّ أَحَدًا أَفْضَلَ مِنْهُ، قَالَ: أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ، وَبَعْدَهُمَا آخَرُ ثَالِثٌ، وَلَمْ يُسَمِّهِ».

"হে আবু জুহাইফা! আপনাকে কি আমি জানিয়ে দিব না যে, এ উম্মতের মধ্যে নবীর পরে কার মর্যাদা সর্বাধিক? আমি বললাম, অবশ্যই। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, এ উম্মতের মধ্যে নবীর পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর পরে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু। তাদের পরে তৃতীয় একজন আছেন, তিনি তার নাম উল্লেখ করেন নি"।[2]

সহীহাইনে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ، يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ آخِذٌ مَنْكِبِي، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، وَقَالَ: مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ،

---

[1] মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস নং ৩২১২৭।

[2] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৮৩৫; তাবরানী আল-আওসাত, হাদীস নং ৯৯২।

وَحَسِبْتُ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ».

"উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর মৃত্যুদেহ খাটের উপর রাখা হলো। খাটটি কাঁধে নেওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত লোকজন তা ঘিরে দো'আ করছিল। আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। হঠাৎ একজন আমার কাঁধের উপর হাত রাখায় আমি চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম, তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু। তিনি উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর জন্য আল্লাহর অশেষ রহমতের দো'আ করছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে উমার, আমার জন্য আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় এমন কোনো ব্যক্তি আপনি রেখে যান নি, যার আমলের অনুসরণ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করব। আল্লাহর কসম! আমার এ বিশ্বাস যে, আল্লাহ আপনাকে (জান্নাতে) আপনার সঙ্গীদ্বয়ের সাথে রাখবেন। আমার মনে আছে, আমি বহুবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি, আবু বকর ও উমার গেলাম। আমি, আবু বকর ও উমার প্রবেশ করলাম এবং আমি, আবু বকর ও উমার বের হলাম ইত্যাদি"।[1]

অন্যদিকে উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর শাহাদাতের বিষয় নিয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার মধ্যে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে সম্মান করতেন, তাকে মর্যাদার আসনে আসীন করতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হিসেবে তার যথাযথ মর্যাদা সংরক্ষণ করতেন। একবার দুজন লোক বসরায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একজন বলতে লাগল, হে আমাদের মা! আপনি আমাদের পক্ষ থেকে অবাধ্যতা প্রাপ্ত হলেন। অন্যজন বলল, হে আমাদের মা! আপনি তাওবাহ করুন, আপনি ভুল করেছেন। তাদের এ আচরণের সংবাদ আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৮৯।

পৌঁছলে তিনি কা‘কা‘ ইবন ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার দরজায় প্রেরণ করেন। সেখানকার উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে তারা উক্ত লোকদ্বয়ের নাম উল্লেখ করেন। ফলে তাদেরকে পাকড়াও করে একশত বেত্রাঘাত করেন এবং তাদেরকে সেখান থেকে বিবস্ত্র করে বের করে দেন।[1]

শা‘বী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জামালের যুদ্ধের পরে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর মৃতদেহ উপত্যকায় দেখে সেখানে নামলেন, অতঃপর তার চেহারা থেকে ধুলা-বালি সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আবু মুহাম্মাদ আপনাকে প্রস্তর প্রান্তরে দেখা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। আল্লাহর কাছে আমার দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বিগ্নতা পেশ করছি। অতঃপর তিনি তার (তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর) জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করলেন। এরপরে তিনি বললেন, হায় আফসোস! আমি যদি এ জঘন্য ঘটনার পূর্বে বিশ বছর আগে মারা যেতাম!

আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আরও বলতেন, আমি অবশ্যই আশা করি, আমি, তালহা ও যুবায়ের সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَنَزَعۡنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنۡ غِلٍّ إِخۡوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٖ مُّتَقَٰبِلِينَ ٤٧﴾ [الحجر: ٤٧]

“আর আমরা তাদের অন্তর থেকে হিংসা বিদ্বেষ বের করে ফেলব, তারা সেখানে ভাই ভাই হয়ে আসনে মুখোমুখি বসবে”। [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৪৭][2]

সুনান বায়হাকী আল-কুবরায়ে তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর গোলাম আবু হাবীবা রহ. বলেন,

---

[1] আল-কামিল ফিত তারীখ, ৩/১৪৪।

[2] উসদুল গাবাহ ৩/৮৬।

«دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ بَعْدَمَا فَرَغَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَمَلِ، قَالَ: فَرَحَّبَ بِهِ وَأَدْنَاهُ وَقَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَنِي اللهُ وَأَبَاكَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝٤٧﴾ [الحجر: ٤٧]، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي كَيْفَ فُلَانَةُ؟ كَيْفَ فُلَانَةُ؟ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ أَبِيهِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: لَمْ نَقْبِضْ أَرْضَكُمْ هَذِهِ السِّنِينَ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ يَنْتَهِبَهَا النَّاسُ، يَا فُلَانُ انْطَلِقْ مَعَهُ إِلَى ابْنِ قَرَظَةَ مُرْهُ فَلْيُعْطِهِ غَلَّةَ هَذِهِ السِّنِينَ، وَيَدْفَعْ إِلَيْهِ أَرْضَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلَانِ جَالِسَانِ، نَاحِيَةً أَحَدُهُمَا الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ: اللهُ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ نَقْتُلَهُمْ وَيَكُونُوا إِخْوَانَنَا فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: قُومَا أَبْعَدَ أَرْضِ اللهِ وَأَسْحَقَهَا، فَمَنْ هُوَ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَنَا وَطَلْحَةُ، يَا ابْنَ أَخِي إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَأْتِنَا».

“জামালের যুদ্ধের পরে আমি ইমরান ইবন তালহার সাথে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কাছে প্রবেশ করলাম। বর্ণনাকারী আবু হাবীবা রহ. বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাকে স্বাগত জানালেন এবং কাছে নিলেন। তাকে বললেন, আমি অবশ্যই আশা করি, আমি এবং তোমার বাবা (তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝٤٧﴾ [الحجر: ٤٧]

“আর আমরা তাদের অন্তর থেকে হিংসা বিদ্বেষ বের করে ফেলব, তারা সেখানে ভাই ভাই হয়ে আসনে মুখোমুখি বসবে”। [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৪৭] অতঃপর তিনি বললেন, হে ভাইপো! অমুক অমুক কেমন আছেন? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সন্তানদের মায়েদের খোঁজ খবর জিজ্ঞেস করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি বললেন, এ বছর তোমাদের সম্পত্তি লুটের সম্ভাবনা না থাকলে আমরা তা দখল করে রাখতাম না (অর্থাৎ তাদের সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য তিনি কবজা করে রেখেছেন, ভোগের জন্য নয়)। অতঃপর তিনি একজনকে আদেশ করলেন, হে অমুক তুমি তার (ইমরান ইবন তালহা) সাথে বনী কুরাইযাতে যাও। তাদেরকে বলো, তারা যেনো এ বছরের ফসল তাকে দিয়ে দেয় এবং তার সম্পত্তি যেনো ফিরিয়ে

দেয়। তখন পাশে বসা দুজন লোক বসা ছিলো, তাদের একজন হারিস আল-‘আওয়ার, সে বলে উঠল, আল্লাহ অধিক ন্যায়পরায়ণ। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো এবং তারা জান্নাতে আমাদের ভাই হবে। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা এখান থেকে উঠে আল্লাহর জমিনের অনেক দূরে চলে যাও, আমার কাছ থেকে দূর হও। আমি এবং তালহা যদি জান্নাতে ভাই ভাই হয়ে আসনে না বসি তাহলে কে বসবে? হে ভাইপো, তোমার কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে সরাসরি আমাদের কাছে চলে আসবে”।[1]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবী ও তাবে‘ঈদের মধ্যে সম্পর্কের অন্যতম নিদর্শন হলো তাদের মধ্যকার বৈবাহিক আত্মীয়তার সম্পর্ক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কন্যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে এবং উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কন্যা হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে বিয়ে করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু’কন্যা রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাকে বিয়ে করেন। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার তিন পুত্রের নাম রাখেন আবু বকর, উমার ও উসমান। তার কন্যা উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে বিয়ে দেন। হাসান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উম্মে ইসহাক বিনত তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমকে বিয়ে করেন। তিনি হাফসা বিনত আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমকেও বিয়ে করেন। তিনি তার সন্তানদের নাম রাখেন আবু বকর, উমার ও তালহা। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার সন্তানের নাম রাখেন উমার। ইমাম জাফর আস-সাদিক রহ. এর মাতৃকুলের নানা হলেন আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু। কেননা তার মা হলেন, ফারওয়াহ বিনত কাসিম

---

[1] সুনান আল-কুবরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং ১৬৭১৫; মুসতাদরাক হাকিম, হাদীস নং ৫৬১৩, ইমাম হাকিম রহ. হাদীসের সনদটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী রহ.ও সহীহ বলেছেন।

ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবু বকর। আর উম্মে কাসিম হলেন, আসমা বিনত আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর। এ কারণে ইমাম জাফর রহ. কে وَلَدَنِي الصديق مرَّتين দু'দিক থেকে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সন্তান বলা হয়।

সাহাবীগণের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা; বিশেষ করে হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যকার ভালোবাসা সম্পর্কে অসংখ্য সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। আর তাদের মধ্যকার এ সুসম্পর্ক বিবেক সম্পন্ন, যৌক্তিক ও সেটি হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা তাদের থেকে কুরআন ও ইসলাম মানুষের কাছে পৌঁছেছে। আর তারাই ইসলামের মূল্যবোধ ও আখলাক আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে অধিক হকদার। বিশেষ করে আল্লাহ মুমিনদের মধ্যে সে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছেন তা পালনে তারা অগ্রগামী। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]

"নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই"। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১০]

তাদের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু"। [সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৭১]

হাদীসে মুমিনদের মধ্যকার পরস্পর ভালোবাসা ও দয়ার ব্যাপারে এসেছে,

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

"মুমিনদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও সহানুভূতির দৃষ্টান্ত একটি মানব দেহের মতো। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন তার সমগ্র দেহ অনিদ্রা

ও তাপ ডেকে আনে (অর্থাৎ কোনো একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে সমগ্র অঙ্গই অসুস্থ হয়ে যায়)”।[1]

একথা সকলেরই জ্ঞাত যে, তাদের যুগ ছিল ইসলামের সোনালী যুগ; যে যুগে ইসলামের আহকাম ও শিক্ষা-দীক্ষা পরবর্তী যে কোনো যুগের চেয়ে পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবায়ন করা হয়েছিলো।

অতএব, কিছু ইতিহাসের কিতাবে তাদের সম্পর্কে যে সব অপব্যাখ্যা এসেছে, যেগুলো পূর্বোল্লিখিত সহীহ হাদীসের সাথে মতানৈক্য ও বিরোধপূর্ণ, সেগুলোর দিকে কর্ণপাত করা যাবে না। কেননা ইতিহাসের খবর যেগুলো সহীহ হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ সেগুলো অধিকাংশই সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতায় হাদীসের সনদের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়; বরং এসবের অধিকাংশই প্রবৃত্তি ও সাম্প্রদায়িকতার কুফল।

জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধ সম্পর্কে ইতিহাসে যা এসেছে তার অধিকাংশই সময়ের দীর্ঘসূত্রিতা ও এসব ঘটনার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অগ্রহণযোগ্য, তাছাড়া সেসব ঘটনার যতটুকু জানা যায় তাও আবার দ্বিধা-সন্দেহ যুক্ত ও পরস্পর বিরোধপূর্ণ। এসব ঘটনা অধিকাংশই খাম-খেয়ালী ও সাম্প্রদায়িকতার কারণে ডালপালা ছড়িয়েছে। সুতরাং এসব ঘটনার ব্যাপারে আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ মুমিন ভাইদের ব্যাপারে আমাদেরকে যেভাবে বলতে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা ঠিক সেভাবেই বলবো। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر: ١٠]

“যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে

[1] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০১১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮৬।

ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু”। [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

এ ধরণের পরিস্থিতিতে আমরা সাহাবীগণের ব্যাপারে ওজর পেশ করবো এ বলে যে, তারা মুজতাহিদ ছিলেন। আর মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবেন, আর ভুল করলে একগুণ সাওয়াব পাবেন। এসব উত্তম লোকদের ব্যাপারে আমাদের এটাই মনে করা উচিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের ঈমান আনয়ন, তাঁর সাহচর্য এবং তাঁর পরে ইসলামের বিজয় ও প্রচার প্রসারে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, মুমিনদের মধ্যে পরস্পর বিরোধের কারণে তাদের ঈমান চলে যায় না। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ۝٩ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ۝١٠﴾ [الحجرات: ٩، ١٠]

“আর যদি মুমিনদের দু’দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করো এবং ন্যায়বিচার করো। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন। নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ- মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা

যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯-১০] এ আয়াতে যুদ্ধে লিপ্ত দুদলকেই মুমিন বলা হয়েছে।

আহলে বাইতের লোকেরা নিষ্পাপ নন এবং তারা শরী‘আতের বিধান প্রণেতাও নন:

যার কোনো ভুল বা গুনাহ নেই তাকে মা‘সূম বা নিষ্পাপ বলে। আর মানুষের মধ্যে যাদের ভুল হওয়া জায়েয নয় তারা তো কেবল নবী-রাসূলগণ। যাদের কাছে আল্লাহ অহী প্রেরণ করেন এবং তা মানুষের কাছে পৌঁছানোর নির্দেশ দেন। কেননা তাদের ভুল হলে আল্লাহর নির্দেশিত দাওয়াতী কাজে ভুল হওয়া অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে।

অন্যান্য মানুষের মতো আহলে বাইতরাও ইজতিহাদ করতেন। এতে তারা সঠিক বা ভুল উভয়টিই করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবেন আর ভুল ইজতিহাদ করলে একটি সাওয়াব প্রাপ্ত হবেন। সহীহাইন ব্যতীত অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের ব্যাপারে বলা যায়,

«إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي، الثَّقَلَيْنِ، وَأَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابُ اللهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، أَلَا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا، حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ».

“আমি তোমাদের জন্য এমন দু’টি ভারী জিনিস রেখে গেলাম, যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। (তাহলো: আল্লাহর কিতাব ও আমার আহলে বাইত)। এর একটি অন্যটির চেয়ে বড়। আল্লাহর কিতাব এমন একটি রশি যা আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত। আরেকটি হলো আমার আহলে বাইত। এ দু’টি আমার সাথে হাউজে কাউসারে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না”।[1] এ হাদীস থেকে এটি বুঝা ঠিক হবে না যে, কুরআন ও সুন্নাহর

---

[1] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১১৫৬১; তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭৮৮। ইমাম তিরমিযী

ন্যায় আহলে বাইতরাও শরী'আতের উৎস (অর্থাৎ তারাও বিধান সংযোগ বা বিয়োজন করতে পারবে, এমনটি বুঝা বৈধ হবে না)।

এ হাদীসটিকে কতিপয় আলেম দ'য়ীফ বা দুর্বল বলেছেন। আর যদি তা সহীহ বলে ধরেও নেওয়া হয়, তবুও আহলে বাইতের সব সদস্যকে অনুসরণ করা প্রমাণ করে না। কেননা তারা একই সময়ে অধিক ছিলেন এবং তারা তাদের মাযহাব ও ফতওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। এতে একদল অন্যদলকে ভুল বলেছেন।

অনুসরণ করতে হবে শুধু কুরআন ও হাদীসের ওপর, যা আল্লাহ সকলের ওপর অনুসরণ করা ফরয করেছেন। উপরোক্ত হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে মেনে নিলে (হাদীস শুদ্ধ ও তার শব্দাবলী সংরক্ষিত মেনে নিলে) তা থেকে শুধু এটিই প্রমাণ করে যে, মৌলিকভাবে তাদের পথ ও সুন্নত অনুসরণ করতে হবে; তখন তা নিম্নোক্ত হাদীসে যা এসেছে সেটার অনুরূপ হবে:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ من بعدي».

"তোমরা আমার পরে আমার সুন্নত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের অনুসরণ করো"।[1] আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে, খোলাফায়ে রাশেদীনরা নিষ্পাপ নন এবং তারা শরী'আতের কোনো বিধানের ক্ষেত্রে ভিন্ন কিছু নন; এমনকি তাদের থেকে ভুল-ত্রুটিও হতে পারে। তারা একের ভুল-ভ্রান্তি অন্যে শুধরিয়ে দিয়েছেন। তারা অন্যান্য মুজতাহিদের মতোই, যিনি ভুল করলে একটি সাওয়াব পান আর ইজতিহাদে সঠিক মতে উপনীত হতে পারলে দু'টি সাওয়াবের অধিকারী হন। (সুতরাং আহলে বাইতের ব্যাপারে আসা হাদীসটিকে উপরোক্ত খোলাফায়ে রাশেদার ব্যাপারে আসা হাদীসের মতই মনে করতে হবে)।

হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

1 আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৭।

হাদীসটি সহীহ হলে ইমাম কুরত্ববী রহ. ‘আল-মুফাহহাম’ এ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেটিই সবচেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা। তিনি বলেছেন, ‘নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতের ব্যাপারে তাঁর এ অসিয়্যত ও বিশেষ গুরুত্বারোপ তাঁর পরিবার-পরিজনকে সম্মান প্রদর্শন, মর্যাদা প্রদান ও তাদেরকে ভালোবাসা অত্যাবশ্যকীয় করে; এ ব্যাপারে কারো কোনো ওযর গ্রহণযোগ্য নয়’।

চতুর্থ অসিয়্যত: আনসারদের ব্যাপারে অসিয়্যত

১- ইমাম বুখারী ও মুসলিম আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন,

«مَرَّ أَبُو بَكْرٍ، وَالعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمْ؟ قَالُوا: ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ، قَالَ: فَصَعِدَ المِنْبَرَ، وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْمِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِالأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত তখন আবু বকর ও আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আনসারদের কোনো একটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার যাওয়ার সময় দেখতে পেলেন, তারা (সকলেই বসে বসে) কাঁদছেন। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কাঁদছেন কেন? তারা বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের মজলিস স্মরণ করে কাঁদছি। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আনসারদের অবস্থা বললেন। বর্ণনাকারী বললেন, (তা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদরের কিনারা দিয়ে মাথা বেঁধে (ঘর থেকে) বেরিয়ে আসলেন এবং মিম্বরে উঠে বসলেন। এ দিনের পর আর তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন নি। তারপর হামদ ও সানা পাঠ করে সমবেত সহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, “আমি আনসারগণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি; কেননা তারাই আমার অতি আপনজন, তারাই আমার বিশ্বস্ত লোক। তারা তাদের ওপর আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূর্ণভাবে পালন করেছে। তাদের যা প্রাপ্য তা

তারা এখনো পায় নি। তাদের ভালো লোকদের উত্তম কার্যকলাপ সাদরে গ্রহণ করবে এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবে”।[1]

২- ইমাম বুখারী ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ، وَتَقِلُّ الأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا، أَوْ يَنْفَعُهُ، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অন্তিম পীড়ায় আক্রান্তকালে) একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে, চাদরের দু-প্রান্ত দু’কাধে পেঁচিয়ে এবং মাথায় একটি পট্টি বেঁধে (ঘর থেকে) বের হলেন এবং মিম্বরে উঠে বসলেন। হামদ ও সানার পর বললেন, “হে লোক সকল! জনসংখ্যা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর আনসারগণের সংখ্যা ক্রমশ: হ্রাস পেয়ে যাবে! এমনকি তারা খাদ্য-দ্রব্যে লবনের মতো (সামান্য পরিমাণে) পরিণত হবে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করে সে ইচ্ছা করলে কারো উপকার বা অপকার করতে পারে, তখন সে যেন উত্তম আনসারদের ভালো কার্যাবলী গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে ভুল-ত্রুটিকারীর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়”।[2]

৩- ইমাম বুখারী ও মুসলিম আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ».

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭৯৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫১০।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৮০০।

“ঈমানের চিহ্ন হলো আনসারদেরকে ভালোবাসা এবং মুনাফিকীর চিহ্ন হলো আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা”।[1]

৪- ইমাম বুখারী ও মুসলিম বারা ইবন আযিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, অথবা তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الأَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ».

“মুমিনরাই আনসারদেরকে ভালোবাসে এবং মুনাফিকরাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যারা তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে আল্লাহ তাদের ঘৃণা করেন”।[2]

৫- ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ».

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না”।[3]

৬- ইমাম বুখারী আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَكَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ مَرَّتَيْنِ».

“একজন আনসারী মহিলা তার শিশুসহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭৮৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৫।

[3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬।

তার সঙ্গে আলাপ করলেন এবং বললেন, “ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন”। এ কথাটি তিনি দু’বার বললেন”।[1]

৭- ইমাম বুখারী ও মুসলিম আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى صِبْيَانًا وَنِسَاءً مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمْثِلًا، فَقَالَ: «اللهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اللهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ يَعْنِي الْأَنْصَارَ».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় শিশু এবং মহিলাদের বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে আসতে দেখলেন। তিনি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, “আমি আল্লাহর নামে বলছি, তোমরা সব লোকদের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয়। আমি আল্লাহর নামে বলছি, তোমরা সব লোকের তুলনায় আমার কাছে অধিক প্রিয়”। তিনি আনসারদের একথা বলেছেন”।[2]

৮- ইমাম আহমদ তার মুসনাদে আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«لَمَّا أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَى مِنْ تِلْكَ الْعَطَايَا فِي قُرَيْشٍ وَقَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْأَنْصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ وَجَدَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِهِمْ، حَتَّى كَثُرَتْ فِيهِمُ الْقَالَةُ..... وفيه: فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، أَلَمْ آتِكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ؟ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ؟ "، قَالُوا: بَلِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ. قَالَ: " أَلَا تُجِيبُونَنِي يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ " قَالُوا: وَبِمَاذَا نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ. قَالَ: " أَمَا وَاللهِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭৮৬।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫১৮০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫০৮।

فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّقْتُمْ، أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ، وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ، وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلًا فَآسَيْنَاكَ، أَوَجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا، تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ؟ أَفَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ فِي رِحَالِكُمْ؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ، اللهُمَّ ارْحَمِ الْأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ" قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ، حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ، وَقَالُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللهِ قِسْمًا وَحَظًّا، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقُوا.

“(হুনায়নের দিবসে) আল্লাহ যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গনীমতের সম্পদ দান করলেন তখন তিনি কুরাইশ ও আরব গোত্রের মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আর আনসারগণকে কিছুই তিনি দেন নি। ফলে আনসারদের একদল নাখোশ হলো এবং তারা এব্যাপারে কথা বলাবলি করতে লাগলো। তাদের সমালোচনা বৃদ্ধি পেলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে আসলেন। আল্লাহর যথযথ হামদ ও সানা শেষে তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, “হে আনসারগণ! আমার ব্যাপারে তোমাদের কথাবার্তা (সমালোচনা) আমার কাছে পৌঁছেছে! তোমরা আমার ওপর রেগে অভিমানে মনে কষ্ট পেয়েছো! অথচ আমি কি তোমাদেরকে গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত পাই নি, যার পরে আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা ছিলে রিক্তহস্ত, যার পরে আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন। তোমরা ছিলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও শত্রু, যার পরে আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরকে জুড়ে দিয়েছেন ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তখন আনসারগন জবাবে বললেন, অবশ্যই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই আমাদের ওপর অধিক ও উত্তম ইহসানকারী। তিনি বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি আমার প্রশ্নের জবাব দিবে না? তারা

বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে কীসের উত্তর দিবো? আমাদের ওপর সব অনুগ্রহ ও অনুকম্পা তো আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে বলতে পারো, আর তোমরা তা সত্যই বলবে, আর তোমরা তা সত্যই বলবে যে, লোকেরা যখন আপনাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছিলো, আমরা তখন আপনার ওপর ঈমান এনেছি, সত্যায়ন করেছি, আপনি সহায়-সাহায্যহীন অবস্থায় এসেছিলেন, আমরা আপনাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছি, আপনি বিতাড়িত অবস্থায় এসেছিলেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি এবং আপনি নিঃস্ব অবস্থায় এসেছেন আমরা আপনাকে সহানুভূতি দিয়েছি। হে আনসারগণ! তোমরা কি তোমাদের মনে এমন কিছুতে কষ্ট পেয়েছো যা ছিল দুনিয়ার সামান্য সম্পদ, যেগুলো ওদেরকে প্রদান করার মাধ্যমে আমি তাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করেছি, যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে? আর আমি তোমাদেরকে তোমাদের ইসলামের ওপর সমর্পন করেছি? হে আনসারগণ! কিন্তু তোমরা কি এ কথার সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোকেরা বকরী ও উট নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের বাড়ি ফিরে যাবে আল্লাহর নবীকে সাথে নিয়ে। যে সত্তার হাতে মুহাম্মাদ এর জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, যদি না আমি হিজরত করে তোমাদের কাছে আগমণ করেছি তা হলে তো আমি আনসারদের মধ্যকারই একজন থাকতাম। যদি লোকজন কোনো উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। হে আল্লাহ আপনি আনসারদেরকে রহমত করুন, আনসারদের সন্তানদেরকে ও তাদের সন্তানদের সন্তানদের রহমত করুন। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে আনসার সম্প্রদায় কাঁদলেন, এমনকি তারা দাঁড়ি ভিজিয়ে ফেললেন। তারা বলতে লাগলো, আমরা আল্লাহর রাসূলের বণ্টন ও

অংশে সন্তুষ্ট। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে থেকে চলে গেলেন এবং তারাও যার যার স্থানে চলে গেলেন।[1]

আনসার কারা? কেন তারা এ মর্যাদাপ্রাপ্ত হলেন?

হাফেয ইবন হাজার ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে বলেন, (الأنصار) আনসার শব্দটি (ناصر) নাসের এর বহুবচন। যেমন (أصحاب) আসহাব শব্দটি (صاحب) সাহেব-এর বহুবচন। অথবা শব্দটি (نصير) নাসির-এর বহুবচন, যেমন (أشراف) আশরাফ শব্দটি (شريف) শরীফ-এর বহুবচন। (الأنصار) আল-আনসার শব্দের মধ্যে লামটি নির্দিষ্টকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনসারকে বুঝানো হয়েছে। এরা আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোক। তারা পূর্বে ‘বনী কাইলা’ নামে পরিচিত ছিলো। একই মায়ের থেকে দু’টি গোত্র একত্রিত হলে তাদেরকে ‘বনী কাইলা’ বলে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আনসার নামকরণ করেছেন। ফলে তারা এ নামে পরিচিত লাভ করেন। তাদের সন্তান-সন্ততি, মিত্র ও দাস-দাসীদেরকেও আনসার হিসেবে অভিহিত করা হয়’।[2]

তাদের মর্যাদার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, আল্লাহ মানবজাতির পঠিত কুরআনে তাদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٩﴾ [الحشر: ٩]

“আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর

---

[1] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১১৭৩০।

[2] ফাতহুল বারী, ১/৬৩।

যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালোবাসে। আর মুহাজিরদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোনো ঈর্ষা অনুভব করে না। নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মন কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম”। [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৯]

আল্লাহর কসম, মানুষের মাঝে তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকার এটি সর্বোত্তম গুণ। ব্যক্তি ও সমাজে তারা বিরাজমান না থাকার চেয়ে কুরআনে তাদের উল্লেখ আরো অধিক সম্মানজনক।

সাইয়্যেদ কুতুব রহ. ‘ফি যিলালিল কুরআন’-এ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতে আনসারদের চারিত্রিক বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো ও গুণাবলী স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ শ্রেণিটি এমন অতুলনীয় গুণে গুণান্বিত ছিলো এবং এতো উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলো যে, বাস্তব জগতে যদি তাদের অস্তিত্ব না থাকতো, তাহলে তারা মানুষের মনে কেবল কল্পনার আকারেই ডানা মেলে উড়ে বেড়াতো এবং কতগুলো শ্রেষ্ঠ উদাহরণ কল্পচিত্র হিসেবেই মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করতো। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ﴾ [الحشر: ٩]

“আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল”। [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৯]

যারা তাদের পূর্বেই এ আবাসভূমি ও ঈমানকে আবাসস্থল বানিয়েছিলো। অর্থাৎ হিজরতের আবাসভূমি মদীনা, যেখানে মুহাজিরদের আগেই আনসাররা বসবাস করতো এবং সেখানে ঈমানকেও তারা তাদের বাসস্থান বানিয়েছিলো, অর্থাৎ ঈমান যেনো তাদের বাড়িঘরে পরিণত হয়েছিলো। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা। ঈমানের সাথে আনসারদের যে ঘনিষ্ঠ অবস্থান ছিলো, সেটিই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। মূলত ঈমানই ছিলো তাদের ঘরবাড়ি ও বাসস্থান, এখানে

তাদের অন্তরাত্মা বাস করতো ও বিশ্রাম নিতো, যেমন মানুষ নিজেদের বাড়িঘরে বাস করে ও বিশ্রাম নেয়।

﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟﴾ [الحشر: ٩]

“আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালোবাসে। আর মুহাজিরদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোনো ঈর্ষা অনুভব করে না”। [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৯]

মদীনার আনসারগণ মুহাজিরদেরকে যেভাবে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন মানবেতিহাসে এ ধরণের ঘটনা সত্যিই বিরল। এতো ভক্তি ও সমাদর, এতো মুক্তহস্তে বদান্যতা, এমন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অংশগ্রহণ, আশ্রয়দান ও দায়ভার বহনে এতো প্রতিযোগিতা ইতিহাসে সত্যিই নজিরবিহীন। আর মুহাজিরদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোনো ঈর্ষা অনুভব করে না”। [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৯] অর্থাৎ মুহাজিরদেরকে কোন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যেমন ‘ফাই’; এসবের ব্যাপারে তাদের মনে লেশমাত্রও দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকতো না।

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌۚ﴾ [الحشر: ٩]

“নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়”। [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৯] নিজের প্রয়োজন থাকা সত্তেও অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া সর্বোচ্চ স্তরের মহানুভবতা। আনসাররা এ স্তরেই উপনীত হয়েছিলো, মানবেতিহাসে যার কোনো উপমা নেই। সকল অবস্থা ও ক্ষেত্রেই তাদের এ মহত্ত্ব উদারতা অব্যাহত ছিলো, যা প্রাচীন ও আধুনিক মানুষের আচরণে একটা অলৌকিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝٩﴾ [الحشر: ٩]

“যাদের মন কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম”। [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৯] বস্তুত মনের ও প্রবৃত্তির সংকীর্ণতা প্রতিটি কল্যাণকর

কাজের প্রধান বাধা। কেননা কল্যাণকর কাজ মাত্রই হচ্ছে তা কোনো না কোনো প্রকারের ত্যাগ স্বীকারের নামান্তর। হয় তা আর্থিক বদান্যতা, নচেত অন্তরে সহানুভূতির বদান্যতা, নচেৎ চেষ্টা সাধনার বদান্যতা, অথবা প্রয়োজনে জীবন ও সময়ের ত্যাগ স্বীকার করা। যে ব্যক্তি এতোটা সংকীর্ণমনা ও স্বার্থপর যে, সব সময় কিছু না কিছু নিতে চায়, কিছুই দিতে চায় না, সে কখনো কোনো কল্যাণমূলক কাজ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি মনের এ সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার উর্ধ্বে ওঠতে পারে। সে কল্যাণকর পথের এ বাধা অতিক্রম করতে পারে এবং দান ও ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। এটাই হচ্ছে প্রকৃত সফলতা।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা আনসারদের পাঁচটি সুউচ্চ গুণাবলী অন্তর্ভুক্ত করে। সেগুলো হচ্ছে:

১- ঈমানকে তারা আবাসস্থান বানিয়েছিলো। অর্থাৎ মুহাজিরদের আগমনের পূর্বেই তারা ঈমান এনেছিলো।

২- মুহাজিদরদেরকে ভালোবেসেছিলো। ভিনদেশীদের প্রতি সাধারণ মানুষের যেরকম বিরূপভাব থাকে তারা মুহাজিদরদের প্রতি তেমন বিরূপভাব পোষণ করেন নি; বরং তারা তাদেরকে ভালোবেসেছিলেন।

৩- তাদের অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত ছিলো। পরদেশীরা সেখানে এসে পার্থিব যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছিলো সে ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনোরূপ ঈর্ষা ছিলো না।

৪- তারা অন্য ভাইকে নিজের ওপরে অগ্রাধিকার দিতেন, যদিও তাদের নিজেদের অভাব থাকতো।

৫- অন্তরের কার্পণ্য ও স্বভাবজাত কৃপণতা থেকে নিজেরা মুক্ত ছিলেন।

বাস্তবিকপক্ষেই যার মধ্যে এসব গুণাবলী পাওয়া যাবে তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা ও তাকে ভালোবাসা অধিক যোগ্য। তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা ও

ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ। আর ভালোবাসা ও রহমতের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এরূপ উপদেশ দেওয়াই হচ্ছে যথার্থ।

আনসারদের অধিকারসমূহ:

১- তাদেরকে সম্মানের সাথে ভালোবাসা, তাদের প্রশংসা করা, তাদের আপত্তিকর সমালোচনা করা হলে তাদের পক্ষ থেকে প্রত্যোত্তর দেওয়া এবং উপরে বর্ণিত হাদীসের উল্লিখিত তাদের সৎগুণাবলী মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসার করা। কেননা তাদের ভালোবাসা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইসলামের ভালোবাসার প্রমাণ।

ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "ঈমানের আলামত হলো আনসারগণকে ভালোবাসা আর নিফাকের আলামত হলো তাদেরকে ঘৃণা করা"। ইসলামের প্রাথমিকযুগে আনসাররা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে যেভাবে অকৃত্রিম ভালোবেসেছেন তা ঈমানের আলামত হিসেবে গণ্য হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদেরকে ঘৃণা করবে এবং তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে তার অন্তরে আল্লাহর নির্ধারিত অত্যাবশ্যকীয় ঈমান থাকবে না।

তাদের সবাইকে ভালোবাসতে হবে, কোনো পার্থক্য করা যাবে না। ইবন হাযাম রহ. 'আল-ইহকাম' গ্রন্থে বলেন, 'এমনিভাবে আনসারদের প্রতি ভালোবাসা সকল আনসারদের প্রতি মহান আল্লাহর এক নি'আমত, যা অন্যদের প্রতি বর্তাবে না। আর তাদের সবাইকে সমভাবে ভালোবাসতে হবে। এ ব্যাপারে একজনকে অন্যের ওপর প্রধান্য দেওয়া যাবে না।

২- উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও ঈর্ষা পোষণ করা যাবে না। এমনকি কেউ কেউ তাদের প্রতি বিদ্বেষকে কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করেছেন। ইবন হাজার হাইতামী রহ. তার 'আয-যাওয়াজের'

কিতাবে বলেছেন, চারশত চৌষট্টি ও পঁয়ষট্টিতম কবীরা গুনাহ হলো, আনসারগণকে ঘৃণা করা ও কোনো সাহাবীকে গালি দেওয়া। ইমাম বুখারী তার সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেছেন,

«من علامة الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، ومن علامة النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ».

"ঈমানের চিহ্ন হলো আনসারদেরকে ভালোবাসা এবং মুনাফিকীর চিহ্ন হলো আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা"।[1]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের সম্পর্কে বলেছেন,

«الأَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ».

"মুমিনরাই আনসারদেরকে ভালোবাসে এবং মুনাফিকরাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যারা তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে আল্লাহ তাদের ঘৃণা করেন"।[2]

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন,

«لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না"।[3]

৩- তাদের কারো সামান্যতম ইহসান থাকলেও তা গ্রহণ করা এবং এর ওপর সন্তুষ্ট থাকা আর তাদের কারো ভুল-ত্রুটি থাকলে তা ক্ষমা করে দেওয়া। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭৮৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৫।

[3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬।

«فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا، أَوْ يَنْفَعُهُ، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ».

“তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করে সে ইচ্ছা করলে কারো উপকার বা অপকার করতে পারে, তখন সে যেন উত্তম আনসারদের ভালো কার্যাবলী গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে ভুল-ত্রুটিকারীর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়”।[1]

৪- আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ইসলামের সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারে তারা যেভাবে সাহায্য করেছেন সে সুন্দর গুণগুলো গ্রহণ করে নেওয়া, তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা এবং আল্লাহ তাদেরকে যেসব সুউচ্চ গুণাবলীতে গুণান্বিত করেছেন সেগুলো গ্রহণের মাধ্যমে অন্তরের সৎগুণাবলীর অনুশীলন করা। কেননা ভালোবাসার অর্থই হলো কাজে-কর্মে ও আমলের মাধ্যমে অংশীদার হওয়া।

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৮০০।

পঞ্চম অসিয়্যত: কর্তৃত্বের অধিকারীর আনুগত্য করা

১- ইমাম মুসলিম ও ইবন হিব্বান রহ. উম্মে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ أَوْ بِلَالًا يَقُودُ بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْآخَرَ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ بِهِ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَقَفَ النَّاسُ، وَقَدْ جَعَلَ ثَوْبَهُ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ تَحْتَ غُضْرُوفِهِ الْأَيْمَنِ كَهَيْئَةِ جُمْعٍ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلًا كَثِيرًا وَكَانَ فِيمَا يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا".

"আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হজ করেছি। আমি দেখেছি উসামা বা বিলাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাওয়ারির লাগাম ধরে হাকঁছিলেন এবং অপরজন নিজের কাপড় দ্বারা তার মাথার উপর রোদকে আড়াল করে ধরে রেখেছিলেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। মানুষ সব দাঁড়িয়ে গেলো। আর তখন তাঁর কাপড়ের প্রান্তদেশ ডান বগলের নিচ থেকে বাম কাঁধের উপর রাখা ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক আলোচনা করলেন। তিনি যা বলেছেন তার মধ্যে এটাও ছিলো, যদি নাক, কান বা অনুরূপ কোন অঙ্গ কাটা কালো গোলামকে তোমাদের নেতা বানিয়ে দেওয়া হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে তাহলে তোমরা তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে"।[1]

২- ইমাম তিরমিযী, ইবন হিব্বান ও হাকেম রহ. আবু উমামা আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯৮; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৪৫৬৪।

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَ: « أيها الناس أطيعوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ».

“হে মানবসকল! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করো এবং তোমাদের আমীরের অনুসরণ করো, তবেই তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে”।[1]

৩- ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী ‘ইরবাদ ইবন সারিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ».

“একদিন ফজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন এক উচ্চাঙ্গের নসীহত করলেন যে, তাতে আমাদের চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন এক ব্যক্তি বললেন: এতো বিদায়ী ব্যক্তির মত নসীহত, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি আমাদের জন্য কী অসিয়্যত করে যাচ্ছেন? তিনি বললেন: তোমাদের আমি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করার অসিয়্যত করছি। যদি হাবশী দাসও আমীর নিযুক্ত হয় তবুও তার প্রতি অনুগত থাকবে, তার নির্দেশ শুনবে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা বহু বিরোধ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা দীনের মধ্যে নতুন নতুন বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে সাবধান থাকবে। কারণ তা হলো

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ৬১৬; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৪৫৬৩; মুসতাদরাক হাকিম, হাদীস নং ১৯।

গুমরাহী। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ যুগ পাবে তার কর্তব্য হলো আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের ওপর অবিচল থাকা। এগুলো তোমরা চোয়ালের দাঁত দিয়ে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রাখবে”।[1]

কর্তৃত্বের অধিকারীর আনুগত্য করা ফরয:

উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা আমীর বা শাসকের গুরুত্ব ও সঠিকভাবে কার্যাবলী পরিচালনায় তার ভূমিকা স্পষ্ট হয়েছে। এসব কার্যাবলী আমীরের আনুগত্য ও মান্য করা ব্যতীত সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে আমীর বা ক্ষমতাশীলের অনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩﴾ [النساء : ٥٩]

“হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯]

ইবন আতিয়্যাহ রহ ‘আল-মুহাররার আল-অজীয’ এ বলেন, জমহুর আলেমের মতে ‘উলুল আমর’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমীর তথা শাসকগণ। আবু হুরায়রা, ইবন আব্বাস ও ইবন যায়েদ প্রমুখ মুফাসসীরগণ এ মত ব্যক্ত করেছেন।

কাযী আবু বকর ইবন আরাবী আল-মালেকী বলেছেন, “আল্লাহ তা‘আলার বাণী ﴿وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾ এর দ্বারা শাসকগণ নাকি আলেমগণ উদ্দেশ্যে এ ব্যাপারে

---

[1] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৭১৪২; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৭; তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৭৬। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

মতানৈক্য রয়েছে। তবে আমার কাছে সঠিক হলো শাসক ও আলেম সবাই উদ্দেশ্য। কেননা মূল কর্তৃত্ব ও শাসনকাজ পরিচালনা তাদের ওপর ন্যস্ত। অন্যদিকে অজানা বিষয়ে আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করা ফরয”।

ফখরুর রাযী রহ. এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা যেহেতু শাসক ও দায়িত্বশীলদের ওপর জনগণের প্রতি ন্যায়বিচার দেখভালের আদেশ দিয়েছেন সেহেতু জনগণের ওপর তাদের অনুগত্য করা ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩﴾ [النساء : ٥٩]

“হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯] এ জন্যই আলী ইবন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন, “শাসকের দায়িত্ব হলো আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী জনগণের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং তাদের আমানত পৌঁছে দেওয়া। তারা যখন তাদের দায়িত্ব আদায় করবে তখন জনগণের ওপর দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে তাদের মান্য করা ও অনুগত্য করা”।

ইমাম ফখরুর রাযী রহ. নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেছেন,

﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ٨٣﴾ [النساء : ٨٣]

“আর যখন তাদের কাছে শান্তি কিংবা ভীতিজনক কোনো বিষয় আসে, তখন তারা তা প্রচার করে। আর যদি তারা সেটি রাসূলের কাছে এবং তাদের কর্তৃত্বের অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিতো, তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা তা উদ্ভাবন করে তারা তা জানত। আর যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না হতো, তবে অবশ্যই অল্প কয়েকজন ছাড়া তোমরা শয়তানের অনুসরণ করতে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮৩]

‘উলুল আমর’ এর ব্যাপারে দু’টি মত রয়েছে।

একটি হলো: আলেম ও মুজতাহিদ, অন্যটি হলো দেশের শাসক। কেউ কেউ দ্বিতীয় মতকে প্রথম মতের ওপর প্রধান্য দিয়েছেন। কেননা জনগণের ওপর শাসকদের কর্তৃত্ব রয়েছে, পক্ষান্তরে আলেমদের ওপর এরূপ কর্তৃত্ব নেই।

আল-কুরআনের এ দিকনির্দেশনা ও আল্লাহর আদেশসমূহ উম্মতের নিবেদিত নসিহতকারী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সুন্নতে নববীতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ».

“যদি তোমাদের ওপর এরূপ কোন হাবশী দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, যার মাথাটি কিশমিশের ন্যায়, তবুও তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর”।[1]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ».

“দুঃখে-সুখে, খুশী-অখুশীতে এবং যদিও অন্য কাউকে তোমার ওপরে প্রাধান্য দেওয়া হয় তবুও সর্বাবস্থায় আমীরের নির্দেশ শোনা এবং তার আনুগত্য করা তোমার জন্য বাধ্যতামূলক”।[1]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১৪২;

ওয়ায়েল ইবন হুজর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালামাহ ইবন ইয়াযীদ আল-জু‘ফী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন,

«يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ».

“হে আল্লাহর নবী! আপনার কী মত, যদি আমাদের ওপর এমন শাসক চেপে বসে যারা আমাদের থেকে তাদের হক (অধিকার) পুরাপুরি দাবী করে কিন্তু আমাদের হক প্রতিরোধ করে রাখে এ অবস্থায় আমাদের কী করার আদেশ করেন? তার কথা শুনে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলে এবারও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলে এবারও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তাদের কথা শ্রবণ করো এবং তাদের আনুগত্য করো। প্রকৃতপক্ষে তাদের বোঝা তাদের ওপরই চাপবে, আর তোমাদের বোঝা তোমাদের ওপর চাপবে”।[2]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

“কেউ যদি আমীরের কোন কিছু অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি সুলতানের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণও সরে যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলী যুগের মৃত্যুর ন্যায়”।[3]

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৩৬।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৪৬।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭০৫৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৪৯।

আনুগত্যের পরিধি:

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীস থেকে এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে, আমীর ভালো হোক আর খারাপ হোক সর্বাবস্থায় তাদের কথা শ্রবণ করা, মান্য করা ও আনুগত্য করতে ইসলামী শরি'আত নির্দেশ দিয়েছে। এতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে ও সমাজে মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে সক্ষম হবে। তবে একথা সকলেরই জানা আবশ্যক যে, তাদের কথা শ্রবণ ও আনুগত্য শুধু সৎ ও কল্যাণকর কাজে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে বলেছেন,

«إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ».

“আমীরের আনুগত্য শুধু সৎ ও কল্যাণকর কাজে”।[1]

অতএব, নিরঙ্কুশ আনুগত্য শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। এটি একমাত্র আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য। আমীর যদি অসৎ বা শরী'আত বিরোধী কোনো কাজের আদেশ দেন তাহলে তার কথা শোনা যাবে না এবং তার আনুগত্যও করা যাবে না। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ».

“মুসলিমের ওপর অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে আমীরের (শাসকের) কথা শোনা এবং আনুগত্য করা, চাই তা তার মনঃপূত হোক বা না হোক। তবে যদি গুনাহের কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় (তাহলে স্বতন্ত্র কথা)। যদি গুনাহের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে তা শোনাও যাবে না, আনুগত্যও করা যাবে না”।[2]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৪০।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৩৯।

অতএব, স্রষ্টার অবাধ্যতা ও গুনাহের কাজে সৃষ্টিজগতের কারো আনুগত্য করা যাবে না।

এখানে একটি সূক্ষ্ম সতর্কতা উল্লেখ করছি যা অনেক মানুষের কাছেই অজানা। তাহলো, গুনাহের কাজে তাদের আনুগত্য না করা মানে তাদের বিরুদ্ধে বের হওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়; বরং তিনি যে গুনাহের কাজের আদেশ দিয়েছেন তা না করা এবং পূর্বোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত সাধারণ আনুগত্য করা অত্যাবশ্যকীয়। মু'তাসিম ও ওয়াসীকের সাথে ইমাম আহমদ রহ. এর ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। মু'তাসিম ও ওয়াসীক ইমাম আহমদকে কুরআন সৃষ্ট বলতে নির্দেশ দেন; কিন্তু ইমাম আহমদ রহ. একথা বলতে অস্বীকার করেন, তবে তিনি আমীরের সাধারণ আনুগত্যশীল ছিলেন এবং লোকদেরকে তাদের বিরুদ্ধে বের হতে নিষেধ করেছেন।

আরেকটি লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, তাদের সাধারণ আনুগত্য ও কথা শোনা মানে তাদেরকে ভালোবাসা অত্যাবশ্যকীয় করে না। এমনিভাবে তাদের মধ্যে পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারীকে ঘৃণা করাও তাদের বিরুদ্ধে বের হওয়া অত্যাবশ্যকীয় করে না। এখানে অনেকেরই পদস্খলণ ঘটে। এ বিষয়টি ভালোভাবে না বুঝার কারণে অনেক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কখনও কোনো পাপের কারণে তাদেরকে ঘৃণা করা অত্যাবশ্যকীয় করে; কিন্তু সাধারণভাবে তাদের অনুগত্য করা ও তাদের কথা শোনা অত্যাবশ্যকীয়। এ সীমালঙ্ঘন করা কারো উচিত নয়। এ পার্থক্যটি ইমাম মুসলিম বর্ণিত আউফ ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» قَالُوا: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ».

“তোমাদের উত্তম শাসক হচ্ছে যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে। তোমরা তাদের জন্য দো‘আ করো এবং তারাও তোমাদের জন্য দো‘আ করে। তোমাদের খারাপ শাসক হচ্ছে, যাদের তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে। তোমরা তাদের অভিশাপ দাও, আর তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এমন অবস্থার উদ্ভব হলে আমরা কি তাদের ক্ষমতাচ্যুত করব না? তিনি বললেন, না, যতদিন তারা তোমাদের মাঝে সালাত কায়েম করে। না, যতদিন তারা তোমাদের মাঝে সালাত কায়েম করে”।[1]

আমীরের বিরুদ্ধে বের হওয়া হারাম:

ইমাম নাওয়াবী রহ. সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘আমীরের বিরুদ্ধে বের হওয়া, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলিমদের ঐকমত্যে হারাম। যদিও তারা ফাসিক ও যালিম হয়। আমি এখানে যে মত ব্যক্ত করেছি এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে’।

ইবন হাজার রহ. ফাতহুল বারী গ্রন্থে ইবন বাত্তাল রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘সকল ফকিহদের মতে, অত্যাচারী আমীরের আনুগত্য করা ও তার সাথে জিহাদে বের হওয়া ফরয। তার বিরুদ্ধে বের হওয়ার চেয়ে তার অনুগত্য করা উত্তম। কেননা এতে রক্তপাত বন্ধ হবে, সাধারণ মানুষ শান্তিতে বাস করবে। ফকিহগণ তাদের সীমালঙ্ঘনের মাত্রা সীমাবদ্ধ করেন নি, যতক্ষণ তাদের থেকে স্পষ্ট কুফরী প্রকাশ না পায়’।

ইমাম ত্বাহাবী রহ. বলেছেন, ‘আমাদের আমীর ও শাসকের বিরুদ্ধে বের হওয়ার অবকাশ নেই যদিও তারা অত্যাচারী হয়। আমরা তাদের বিরুদ্ধে বদদো‘আ করব না এবং তাদের আনুগত্য থেকে আমরা সরে যাবো না। আমরা মনে করি, তাদের আনুগত্য করা মানে আল্লাহর আনুগত্য করা, যা ফরয।

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৫৫।

যতক্ষণ তারা গুনাহের কাজের আদেশ না দেয়। তাদেরকে সংশোধন ও সুপথের দিকে আহ্বান করবো’।

এ ব্যাপারে আমাদের সৎ উত্তরসূরীদের ইজমা হলো তাদের বিরুদ্ধে বের হওয়া যাবে না, কেননা তাদের বিরুদ্ধে বের হলে সমাজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও মানুষের মাঝে হয়রানি দেখা দিবে। এতে মানুষ দীন ও দুনিয়ার কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবে না।

আমীরুল মুমিনীন আলী ইবন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমীর ব্যতীত মানুষের কল্যাণ হতে পারে না, চাই সৎ ও ন্যায়পরায়ন হোক বা পাপিষ্ঠ। যদি আমীর পাপিষ্ঠ হয় (এতে অসুবিধে নেই, কেননা) মুমিন এসময় তার রবের ইবাদাত করবে। আর পাপীকে তার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়”।[1]

আবু হারেস আস-সায়েগ বলেন, ‘আমি আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল)-কে বাগদাদের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম অর্থাৎ শাসকের বিরুদ্ধে লোকদের বের হওয়া সম্পর্কে। তাকে বললাম, হে আবু আব্দুল্লাহ যারা আমীরের বিরুদ্ধে বের হয়েছে তাদের সাথে বের হওয়া সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন? তিনি আমীরের বিরুদ্ধে বের হওয়ার বিষয়টিকে খুব খারাপ বলে জানালেন। তিনি বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ! রক্তপাত! রক্তপাত! আমি বের হওয়া সঠিক মনে করি না। আর এ ব্যাপারে কাউকে বের হতে নির্দেশও দিচ্ছি না। আমরা যে অবস্থায় আছি এতে ধৈর্যধারণ করা ফিতনার চেয়ে উত্তম। তাতে রক্তারক্তি হবে, মানুষের ধন-সম্পদ হালাল মনে করবে এবং মানুষের মান-সম্মানের অপমানিত করা হবে। এ ফিতনার দিনে মানুষ কেমন আছে তা তুমি ভালো করেই জানো। আমি বললাম, তাহলে বর্তমানে মানুষ কি ফিতনায় পতিত হয় নি? তিনি বললেন, যদিও তারা ফিতনায় পড়েছে, তবে তা নির্দিষ্ট ফিতনা।

---

[1] তাফসীরে ত্বাবারী। আমি এ নসটি তাফসীরে ত্বাবারীতে পাই নি। -অনুবাদক।

আর যখন তরবারি নিয়ে মানুষ নেমে পড়বে তখন ফিতনাটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং সব ধরণের শান্তির পথ বিনষ্ট হবে। তাই এ ফিতনায় ধৈর্যধারণ করা এবং দীনকে রক্ষা করা যুদ্ধের ফিতনায় পতিত হওয়ার চেয়ে উত্তম’।

কেউ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখবে, ইসলামে সর্বপ্রথম মহাবিপদ ও মহাবিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিল মুসলিমের একদল লোক হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমাম উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বিরুদ্ধে বের হওয়ার মাধ্যমে। অতঃপর হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমাম আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বিরুদ্ধে বের হওয়া। আমীরের আনুগত্য থেকে বের হওয়া মুসলিম উম্মাহ ও দীনের ক্ষতি ছাড়া তেমন কোনো সুফল বয়ে আনে না।

কর্তৃত্বশীল বা শাসকের প্রতি কল্যাণকামী হওয়া:

তামীম আদ-দারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».

“কল্যাণ কামনাই দীন। আমরা বললাম, কার জন্য কল্যাণ কামনা? তিনি বললেন, আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের জন্য কল্যাণ কামনা”[1]

শাসকের প্রতি জনগণের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো তাদেরকে নসীহত করা ও তাদের কল্যাণ কামনা করা। নসীহত বলতে সৎ উপদেশ, আদেশ ও নিষেধ ইত্যাদি যা কিছু মানুষ বুঝে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব, আমীরের জন্য নসিহত হলো তাকে সৎকাজের আদেশ দেওয়া, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা এবং তাকে কল্যাণকর কাজে পথ দেখানো ও অকল্যাণকর কাজ থেকে সতর্ক করা।

[1] মুসলিম, হাদীস নং ৫৫।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ».

“আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ পছন্দ করেন এবং তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। তোমাদের জন্য তিনি যা পছন্দ করেন, তা হলো তোমরা তাঁরই ইবাদাত করবে, তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক করবে না, সকলে আল্লাহর রজ্জু শক্তভাবে ধারণ করবে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না এবং আল্লাহ যাকে তোমাদের ওপর দায়িত্বে নিযুক্ত করেন তাকে সদুপদেশ দেওয়া ও তার কল্যাণ কামনা করা”।[1]

এমনিভাবে তাদের সাথে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে চলা, অন্তরে মুনাফেকী গোপন না রাখা, তাদের সাথে ধোঁকাবাজি না করা বা তাদের ক্ষতি করার ইচ্ছা পোষণ না করা। জুবায়ের ইবন মুত‘ইম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মিনায় মসজিদে খাইফে’ বলেছেন,

«ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ العَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ ولاة الأمور، وَلُزُومُ جَمَاعَة المسلمين».

“তিনটি বিষয়ে কোনো মুসলিম ব্যক্তির অন্তর যেন প্রতারিত না হয়: নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা, যাকে কর্তৃত্বের অধিকারী করা হয়েছে তাকে সদুপদেশ দেওয়া এবং তাদের মুসলিমের জামা‘আতের সাথে একত্রিত থাকা”।[2]

এছাড়াও তাদের তাওফিক ও সাহায্য কামনা করে আল্লাহর কাছে দো‘আ করা। কেননা আমীরের বরকত সর্বসাধারণকেও শামিল করে। এ কারণেই ফুদাইল

---

[1] মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ৮২৫; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৩৩৮৮।

[2] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৩৩৫০; তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৫৮; হাকেম, হাদীস নং ২৯৪।

ইবন 'ঈয়াদ রহ. বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন, 'আমার যদি কবুল হওয়া কোনো দো'আ থাকতো তবে তা আমি আমীরের জন্য রেখে দিতাম (তার জন্য করতাম)'। এটি ইমাম ফুদাইল ইবন 'ঈয়াদ রহ.-এর গভীর জ্ঞানগর্ভ উক্তি।

ষষ্ঠ অসিয়্যত: মুসলিমের মান-সম্মান রক্ষা

১- ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিনে বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন,

«أَيُّ يَوْمٍ هَذَا» ، فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا» فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ بِذِي الحِجَّةِ» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قَالَ «أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الحَرَامِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا».

“আজ কোন দিন? আমরা চুপ থাকলাম এবং ধারণা করলাম যে, এ দিনটির আলাদা কোনো নাম তিনি দিবেন। তিনি বললেন, এটি কুরবানীর দিন নয় কি? আমরা বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটি কোন মাস? আমরা চুপ থাকলাম এবং ধারণা করতে লাগলাম যে, তিনি হয়ত এর (প্রচলিত) নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম দিবেন। তিনি বললেন, এটি যিলহজ মাস নয় কি? আমরা বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটি কোন শহর? আমরা চুপ ছিলাম, তিনি বললেন, এটি কি সম্মানিত মক্কা নগরী নয়? আমরা বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, (জেনে রাখো) তোমাদের জান, তোমাদের মাল, তোমাদের সন্মান, তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকের এ দিন, আজকের এ মাস ও আজকের এ শহর তোমাদের জন্য সম্মানিত ও হারাম”।[1]

২- ইমাম বুখারী ও মুসলিম জারীর ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিদায় হজের দিনে বলেছেন,

«اسْتَنْصِتِ النَّاسَ» فَقَالَ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৭৯।

"তুমি লোকদেরকে চুপ করিয়ে দাও, তারপর তিনি বললেন, আমার পরে তোমরা কাফির (এর মত) হয়ে যেও না যে, একে অপরের গর্দান কাটবে"।[1]

ভূমিকা:

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সর্বাধিক শক্তিশালী ও মজবুত বন্ধন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ﴾ [الحجرات: ١٠]

"নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই"। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖ﴾ [التوبة: ٧١]

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু"। [সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৭১]

ইসলামী শরী'আত এ বন্ধনকে স্বীকৃতি ও মজবুত করতে এসেছে। ফলে যা কিছু এ বন্ধনকে শক্তিশালী ও মজবুত করে সেগুলো পালনের নির্দেশ দিয়েছে আর যেসব কারণে বা যে সব উপায়ে এ বন্ধনে ত্রুটি দেখা দেয় সেগুলো নিষেধ করেছে।

ইসলামী শরী'আত এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের অধিকারসমূহ স্পষ্টভাবে ও পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করেছে। মুসলিমের মর্যাদা ও সম্মানও বর্ণনা করেছে। এক মুসলিমের জান, মাল ও সম্মান অপর মুসলিমের জন্য হারাম। রহমত ও হিদায়াতের নবী এ সব অধিকার সংরক্ষণ করতে সর্বদা অসিয়্যত করেছেন এবং এ সীমা অতিক্রম করতে কঠোরভাবে বারণ করেছেন। এমনকি তিনি মহাসম্মেলন ও মহামিলন মেলা বিদায় হজের ভাষণেও এ উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মুসলিমের মান-মর্যাদা রক্ষায় অবস্থাভেদে সব ধরণের

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫।

গুরুত্বারোপ করেছেন। উম্মতের ওপর তিনি যেসব উপদেশ ও ভালোবাসা দেখিয়েছেন সেসবের জন্য আল্লাহ তাঁর নবীর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার কা‘বার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন,

«مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ».

“কতো মর্যাদা তোমার, কত বিরাট সম্মান তোমার! কিন্তু আল্লাহর নিকট মুমিনের মর্যাদা তোমার চেয়েও অনেক বেশী”।[1]

মুসলিমের রক্ত হারাম:

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣﴾ [النساء : ٩٣]

“আর যে ইচ্ছাকৃত কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লা‘নত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৯৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

“কোনো মুমিনকে গালি দেওয়া ফাসেকী, আর তাকে হত্যা করা কুফুরী”।[2]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ২০৩২, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৪।

“কোনো মুসলিম ব্যক্তি যিনি সাক্ষ্য দেন যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তিন-তিনটি কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। তাহলো বিবাহিত ব্যভিচারী, প্রাণের বদলে প্রাণ এবং আপন দীন পরিত্যাগকারী মুসলিম জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ».

“একজন মুমিন ব্যক্তির অন্যায়ভাবে নিহত হওয়ার চেয়ে গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অধিক সহজ ও সাধারণ ব্যাপার”।[2]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম ব্যক্তির ইসলামের মানদণ্ড করেছেন যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

“মুসলিম সে ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে”।[3]

মুসলিমের মান-সম্মান হারাম:

মুসলিমের মান-সম্মানের মর্যাদা তাঁর রক্তের মর্যাদার চেয়ে কম নয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٥٨﴾ [الاحزاب : ٥٨]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৮৭৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৭৬।

[2] নাসাঈ আল-কুবরা, হাদীস নং ৩৯৮৭; তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৯৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৬১৯।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪১।

“আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোন অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয়, নিশ্চয় তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৮]

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মিম্বারে আরোহণ করে উচ্চস্বরে ডেকে বলতে লাগলেন,

«يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فضحه ولو في قعر بيته».

“হে লোকজন! তোমরা যারা মুখে মুখে ঈমান এনেছ; কিন্তু অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করে নি, তোমরা মুসলিমের গীবত করো না এবং তাদের দোষ-ত্রুটিও অনুসন্ধান করো না (ইজ্জত নষ্ট করো না)। কেননা, যারা কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে বেড়ায় (ইজ্জত নষ্ট করতে চায়), আল্লাহও তাদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করেন (ইজ্জত নষ্ট করেন)। আর আল্লাহ যাকে অসম্মানিত করতে চান, তাকে তিনি তার ঘরে হলেও অপদস্থ করেন”।[1]

হাদীসে আরও এসেছে,

«الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ».

“রিবার (সুদের) তেহাত্তরটি শাখা রয়েছে। সবচেয়ে সহজ শাখা হলো কোনো ব্যক্তি তার মাকে বিয়ে করা, আর সর্বাধিক রিবা (সুদ) হলো মুসলিম ব্যক্তির সম্মানহানী করা”।[2]

---

[1] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১৯৭৭৬; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৮৮০; ইবন হিব্বান; তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী হাসান গরীব বলেছেন।

[2] মুসতাদরাক হাকিম, হাদীস নং ২২৫৯। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সুবহানাল্লাহ! মুসলিমের মর্যাদা ও মান-সম্মান কতই না উঁচু।

মুসলিমের ধন-সম্পর অন্যের জন্য হারাম:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مسلم إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».

“কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ তার সন্তুষ্টচিত্ত ব্যতীত অন্য কারো জন্য হালাল নয়”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».

“যে ব্যক্তি তার ওপর অর্পিত চূড়ান্ত কসমের মাধ্যমে কোনো মুসলিমের সম্পদ গ্রাস করে অথচ সে মিথ্যাবাদী, আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় তার সাক্ষাৎ ঘটবে যে, আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন”।[2]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীতে উপরোক্ত সব ধরণের সতর্কতা একত্রিত হয়েছে। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন,

«أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ».

“তোমরা কি বলতে পার, অভাবগ্রস্ত কে? তারা বললেন, আমাদের মধ্যে যার দিরহাম (টাকা কড়ি) ও ধন-সম্পদ নেই সেই তো অভাবগ্রস্ত। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সেই প্রকৃত অভাবগ্রস্ত, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, একে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ ভোগ করেছে, একে

---

[1] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ২০৬৯৫।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৮।

হত্যা করেছে ও একে মেরেছে। এরপর একে তার সাওয়াব থেকে দেওয়া হবে, একে তার সাওয়াব থেকে দেওয়া হবে। এরপর পাওনাদারের হক তার ভালো আমল থেকে পূরণ করা না গেলে ঋণের বিনিময়ে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে”।[1]

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮১।

সপ্তম অসিয়্যত: নারীদের সম্পর্কে অসিয়্যত

১- ইমাম তিরমিযী ও ইবন মাজাহ রহ. আমর ইবন আহওয়াস রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতা (আহওয়াস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হজে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হামদ ও সানা শেষে (উম্মতের উদ্দেশ্যে) কতিপয় উপদেশ প্রদান করলেন। এতে তিনি বললেন,

«أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ».

"শোনো, তোমরা স্ত্রীদের সাথে কল্যাণের অসিয়্যত গ্রহণ করো, (উপদেশ নাও)। তারা তো তোমাদের কাছে বন্দী (নিরুপায়)। তা ছাড়া আর কোনো বিষয়ে তোমরা তাদের মালিক নও; কিন্তু তারা যদি সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় তবে ভিন্ন কথা। তারা যদি তা করে তবে তাদের শয্যায় তাদের আলাদা রাখবে, মৃদু প্রহার করবে, কঠোরভাবে নয়। তারপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে তবে আর তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করবে না (তাদেরকে তালাক দিবে না)। সাবধান! তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে আর তোমাদের ওপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো, যাদের তোমরা অপছন্দ করো তাদের তোমাদের ঘরে স্থান দিবে না অথবা যাদের তোমরা অপছন্দ করো, তাদের গৃহে অনুমতি দিবে না।

শোনো, তোমাদের ওপর স্ত্রীদের অধিকার হলো, তাদের ভরন-পোষণ ক্ষেত্রে তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করবে”।[1]

মুসনাদে শিহাব গ্রন্থে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, এটি ছিলো বিদায় হজের কুরবানীর দিনের ভাষণ।

২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজের বিবরণ বর্ণনায় সহীহ মুসলিমে জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে আরাফাতের ময়দানের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ».

“তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর দেয়া নিরাপত্তার মাধ্যমে গ্রহণ করেছ। আর তাদের লজ্জাস্থান তোমরা হালাল করেছ আল্লাহর কালেমা তথা ওয়াদার মাধ্যমে”।[2]

এ দু’টি হাদীস সময়ের ব্যাপারে বাহ্যিকভাবে বিরোধ রয়েছে। এর বিরোধ নিরসনে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের দিনে বিদায় হজের ভাষণে নারীর ব্যাপারে অসিয়্যত করেছেন, অতঃপর কুরবানীর দিনে তাঁর কুরবানীর সালাতের ভাষণেও নারীর সম্পর্কে অসিয়্যত করেছেন।

ইসলামের নারীর মর্যাদা:

মুসলিম সমাজে নারী পিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এক কন্যা হয়ে লালিত-পালিত হয়। বিয়ের পরে তার প্রিয় স্বামী তার যাবতীয় প্রয়োজন মিটায়, স্বামীর গৃহ তারই গৃহ হয়ে যায়, উভয়ে পরস্পর ভালোবাসা ও রহমত বিনিময় করে

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ১১৬৩। তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৮৫১।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

থাকেন। মা তার সম্রাজ্যে তার ছেলে-সন্তান, নাতী-নাতনী বা তার আত্মীয়কে তার কাধে-পিঠে করে যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণে লালন-পালন করে থাকেন।

পক্ষান্তরে কিছু সমাজে মানবরূপী হায়েনারা নারীদেরকে চোখের আকর্ষণ, ভোগ-বিলাস ও লালসার উপকরণ মনে করে, যারা তাদের থেকে ভোগ ছাড়া আর কিছুই আশা করে না অথবা তারা নারীকে সমান অধিকারের নামে পুরুষের অংশীদার বানিয়ে তার ঘরের সব কাজে অংশগ্রহণ করায়, এমনকি ঘর ও গাড়ির কিস্তি পরিশোধেও তাকে সমানহারে অংশগ্রহণ করতে হয় অথবা তাদের সন্তানেরা তাদেরকে বৃদ্ধ বয়সে দেখা-শুনার ঝামেলা এড়ানোর জন্য বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়। এর চেয়ে তাদের আর কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না!

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার:

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে তাওহীদের আলোচনার সাথেই পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾ [الاسراء: ٢٣، ٢٤]

"আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বলো, হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন"। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩-২৪]

কাযী আবু বকর ইবন 'আরাবী আল-মালেকী রহ. 'আহকামুল কুরআন' এ উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা দীনের

অন্যতম একটি রুকন। আর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কথা ও কাজ উভয় মাধ্যমে হতে হবে’।

পিতামাতা কাফির হলেও এমনকি তারা সন্তানকে কুফুরী করতে বাধ্য করলেও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٥﴾ [لقمان: ١٥]

“আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শির্ক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ করো তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে”। [সূরা লুকমান, আয়াত: ১৫]

পাক-পবিত্র সুন্নাতে রাসূলে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও উত্তম আচরণের সর্বাধিক গুরুত্ব এসেছে। তাদেরকে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশী হকদার বলে ঘোষণা দিয়েছে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ».

“হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশি হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তারপরে তোমার

বাবা”।[1] এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে বাবার ওপর তিনবার অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

অন্যদিকে পিতামাতার সাথে অবাধ্যতাকে শরী‘আত কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত করেছে। আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» ثَلاَثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ - أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ» ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

“একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করাবো না? সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, তাহলো, আল্লাহর সাথে শির্ক করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এবার সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, শুনে রাখো, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া -এ কথাটি তিনি বার বার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, আর যদি তিনি না বলতেন”।[2]

স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ:

আল-কুরআন বলেছে, বিয়ে-শাদীর মূল উদ্দেশ্য হলো স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে প্রশান্তি, ভালোবাসা ও রহমত বজায় থাকা। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةً﴾ [الروم: ٢١]

“আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর

[1] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৪৮।

[2] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৭।

তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন"। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১]

আল-কুরআন স্ত্রীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। যদি কোনো কারণে স্ত্রীর সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন সুন্দরভাবে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [النساء : ١٩]

"আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

"অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২৯]

আল্লাহ তা'আলা নারীকে যে রূপ অধিকার দিয়েছেন তেমনি স্বামীর জন্যও নারীর ওপর অনুরূপ অধিকার সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

"আর স্ত্রীদের জন্য তেমন অধিকার থাকবে যেমনি তাদের উপর (স্বামীর জন্য) দায়-দায়িত্ব রয়েছে প্রচলিত নিয়মে।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রজ্ঞাময় এককথায় তাদের সাথে সদাচরণ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ».

“পরিপূর্ণ ঈমানদার মুমিন হলো সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সুন্দর। তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي».

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম ব্যক্তি”।[2]

স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাদাভাবে তাদের অধিকার বর্ণনা করেছেন। মু‘আবিয়াহ ইবন হাইদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন,

«يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: "وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللَّهُ».

“আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! স্বামীদের ওপর স্ত্রীদের কী কী অধিকার? তিনি বললেন, যা সে খাবে তাকেও (স্ত্রী) তা খাওয়াবে, আর সে যা পরিধান করবে তাকেও তা পরিধান করাবে। তার চেহারায় মারবে না এবং তাকে গাল-মন্দ করবে না। আর তাকে ঘর থেকে বের করে দিবে না”। [3]

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ১১৬২, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[2] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৮৯৫, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[3] আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৪২। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, পরস্পরের ছাড় ও ত্যাগ ব্যতীত সুন্দর বসবাস ও সুখী জীবন সম্ভব নয়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ».

"কোনো মুমিন পুরুষ কোনো মুমিন নারীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে না; (কেননা) তার কোনো চরিত্র অভ্যাসকে অপছন্দ করলে তার অন্য কোনো (চরিত্র-অভ্যাস) টি সে পছন্দ করবে"।[1]

আর আল-কুরআন এ দিকেই ইশারা দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর বসবাসের আয়াতে বলেছে,

﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء : ١٩]

"আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯]

কন্যা সন্তানের প্রতি ভালোবাসা:

বিভিন্ন যুগে অনেক সমাজেই মানুষ পুত্র সন্তানকে বেশি ভালোবাসে এনং তাকে কন্যা সন্তানের ওপর অগ্রাধিকার থাকে। এজন্যই ইসলামী শরী'আত সন্তানদের মধ্যে সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন, ছেলে-মেয়ে উভয়কেই দান ও হেবার ক্ষেত্রে সমানাধিকার দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নু'মান ইবন বাশীরের বাবা বাশীর আল-আনসারীকে দানের ক্ষেত্রে তার পুত্র সন্তানকে তার অন্য ভাইদের ওপর বিশেষ প্রধান্য দেওয়া দেখে বললেন,

«فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ».

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৬৯।

“আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, তুমি তোমার সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখো”।[1]

সৎপূর্বসূরীরা ছেলে-মেয়ের মাঝে সবক্ষেত্রে সমতা বিধান করা ফরয বলেছেন এমনকি তাদেরকে চুম্বন করার ক্ষেত্রেও সমানহারে চুম্বন করতে হবে। এ ব্যাপারে ত্রুটি করা থেকে সুন্নতে নববী সতর্ক করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ، وَالْمَرْأَةِ»

“হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বলের অর্থাৎ ইয়াতীম ও নারীর অধিকার (নস্যাৎ করা) নিষিদ্ধ করছি”।[2] অর্থাৎ ইয়াতীম ও নারীর অধিকার খর্ব করার গুনাহ থেকে আমি আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি।

এমনিভাবে তাদেরকে উত্তমরূপে লালন-পালন করার ব্যাপারে হাদীসে অনেক উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কন্যা সন্তানের লালন-পালন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম থেকে আড়াল হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ سِتْرًا لَهُ مِنَ النَّارِ».

“যাকে এসব কন্যা সন্তানের দ্বারা কোনোরূপ পরীক্ষা করা হয় এবং সে তাদেরকে উত্তমরূপে লালন-পালন করে, তবে সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে পর্দা হয়ে দাঁড়াবে”।[3]

এরচেয়েও বড় অঙ্গিকার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, আর তা হলো কন্যা সন্তানের লালন-পালনকারী তাঁর সাথে জান্নাতে একত্রে থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ» وَضَمَّ أَصَابِعَهُ».

---

[1] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৮৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬২৩।

[2] সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৯১০৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৬৭৮।

[3] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬২৯।

“যে ব্যক্তি দু’টি কন্যা সন্তানকে প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে, কিয়ামত দিবসে সে ও আমি এমন অবস্থায় আসব, এই বলে তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো একত্র করলেন”।[1]

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৩১।

অষ্টম অসিয়্যত:

দাস-দাসীর (চাকর-বাকরের) অধিকার প্রদানের অসিয়্যত

১- ইমাম হাকেম ও ইবন হিব্বান আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

«كَانَ آخِرُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ، وَمَا كَانَ يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ: «الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».

“রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তিম মুহূর্তে তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছিলো এবং তাঁর মুখের ভাষায় এ অসিয়্যত ছিল যে, “সালাত, সালাত (অর্থাৎ সালাত পড়বে) এবং তোমাদের দাস-দাসীর ব্যাপারে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে (অর্থাৎ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে)”।[1]

২- ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও ইবন মাজাহ রহ. আলী ইবন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

«كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».

“রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সর্বশেষ কথা ছিল, সালাত, সালাত (অর্থাৎ সালাত ঠিকভাবে আদায় করবে) এবং তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে (অর্থাৎ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে)”।[2]

---

[1] ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৬৬০৫, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন; আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৫৬; মুসতাদরাক হাকিম, হাদীস নং ৪৩৮৮; মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৬৬৮৪, তিনি উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শু‘আইব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন।

2 আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৫৬; মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৫৮৫, শু‘আইব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, আর এ হাদীসের সনদটিকে হাসান বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ভূমিকা:

প্রাক ইসলামী যুগে দাস-দাসীরা তাদের মনিবের ইচ্ছামতো কাজ করতো, তাদেরকে তাদের সাধ্য ও সামর্থ্যের বাহিরেও বোঝা চাপিয়ে দিতো। মনিবের সেবা করতে জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু খাবারের দরকার ছিলো শুধু ততটুকো খাবার তাদেরকে দেওয়া হতো। তা স্বত্বেও তাদেরকে কাজের সময় মনিবের চিত্তবিনোদনের জন্য বেত্রাঘাত করা হতো। মনিবেরা এসব দরিদ্র দাস-দাসীদেরকে নির্যাতন করে আনন্দ পেতো। আর এ অবস্থা ছিলো রোমান সম্রাজ্যের দাস-দাসীর।

পারস্য, ভারত, আরব ও অন্যান্যদের অবস্থা এর চেয়ে ভালো ছিলো না। এমন সময় মানবতার দয়ালু ও স্নেহশীল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটে। তিনি দাস-দাসীকে এমন অধিকার প্রদান করেছে যা তাদেরকে ইসলামে নেতৃত্বের স্থানে সমাসীন করেছে। মনিব ও দাস-দাসীকে শরী‘আতের দায়িত্ব-কর্তব্য ও আদেশ-নিষধ পালনে সমান করেছেন। কৃতদাস সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে সুউচ্চ আসনে বসিয়েছেন। সুহাইব আর-রূমী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর মর্যাদা সুউচ্চ করেছেন। তিনি বিলাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সম্পর্কে বলেছেন,

«فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ».

“আমি জান্নাতে তোমার পায়ের খড়মের ধ্বনি আমার সম্মুখ দিক থেকে শুনতে পেয়েছি”।[1]

দাস-দাসী ও মনিবের মধ্যে ভাই ভাই বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। উঁচু-নিচু বা স্বৈরাচারী আচরণ বর্জন করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[1] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৪৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৫৮।

«إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ».

তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাস-দাসীদের সম্পর্কে সর্বদা অসিয়্যত করতেন, এমনকি জীবনের শেষ সময়ে সালাতের সাথে তিনি দাস-দাসীদের অধিকার আদায় করতে উম্মতকে অসিয়্যত করে গেছেন।

দাস-দাসী ও খাদেমের সাথে সদাচরণ:

ইসলামী শরী'আত দাস-দাসী ও চাকর চাকরাণীর সাথে সদাচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে সব ধরণের আদেশ দিয়েছে যা সর্বদিক শামিল করেছে। তাদের সাথে মানসিক দিক থেকে সদাচরণের ব্যাপারে ইসলাম তাদেরকে ডাকার সময় অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي».

"তোমাদের কেউ যেন এরূপ বলে না ডাকে "আমার দাস, আমার দাসী; বরং বলবে, আমার বালক, আমার বালিকা ও আমার খাদেম"।[2]

এমনিভাবে খাবার গ্রহণের সময়ও তাদের অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ».

"তোমাদের কারো খাদেম খাবার নিয়ে আসলে হলে তাকেও নিজের সাথে বসানো উচিত। তাকে সাথে না বসালে দু' এক লোকমা কিংবা দু' এক গ্রাস

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৬১।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৪৯।

তাকে দেওয়া উচিত। কেননা সে এর জন্য পরিশ্রম করেছে”।[1] অর্থাৎ সে এ খাবার তৈরি করেছে।

দাস-দাসীর শারীরিক দিক থেকে ইহসান করতে ইসলাম তাদের সাধ্যের অধিক কোনো কাজ করাতে নিষেধ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»

“এবং তাদের সাধ্যাতীত কোনো কাজে বাধ্য করো না। তোমরা যদি তাদের শক্তির উর্ধ্বে কোনো কাজ তাদের দাও তবে তাদের সহযোগীতা করো”।[2]

তাদেরকে কেউ প্রহর করলে তিনি তার ব্যাপারে কঠোর শাস্তি ও সতর্ক করেছেন। আবু মাসউদ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

«كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: «اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ» ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ» ، أَوْ «لَمَسَّتْكَ النَّارُ».

“আমি আমার এক ক্রীতদাসকে প্রহার করছিলাম। হঠাৎ আমার পিছন দিক থেকে একটি শব্দ শুনলাম, হে আবু মাস‘উদ! জেনে রেখো, তুমি তার ওপর যেরূপ ক্ষমতাবান, আল্লাহ তোমার ওপর এর চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। হঠাৎ পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাবধান! যদি তুমি তা না করতে তাহলে অবশ্যই জাহান্নাম তোমাকে

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৬৩।

[2] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৬১।

গ্রাস করতো। কিংবা (রাবীর সন্দেহ) জাহান্নাম তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করতো”।[1]

দাস-দাসীর অধিকারসমূহ:

ইসলামে দাস-দাসীরা মনিবের চেয়ে কোনো অংশেই নিম্নমানের সৃষ্টি নয়; বরং সৃষ্টিগত দিক থেকে দাস-দাসী ও মনিব সবাই সবাই। আল্লাহর হিকমত অনুযায়ী মানুষের মাঝে এ ধরণের পার্থক্য হয়েছে। যাতে আল্লাহর ইচ্ছা পরিপূর্ণ হয়, তাহলো পৃথিবী পরিচালনা ও এর দ্বারা আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ তা‘আলা এ ধরণের পার্থক্য সম্পর্কে কুরআনে বলেছেন,

﴿أَهُمۡ يَقۡسِمُونَ رَحۡمَتَ رَبِّكَۚ نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗاۗ وَرَحۡمَتُ رَبِّكَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ٣٢﴾ [الزخرف: ٣٢]

“তারা কি তোমার রবের রহমত ভাগ-বণ্টন করে? আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দেই এবং তাদের একজনকে অপর জনের ওপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরকে অধিনস্থ হিসেবে কাজে লাগাতে পারে। আর তারা যা সঞ্চয় করে তোমার রবের রহমত তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট”। [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৩২]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖ﴾ [النساء : ٢٥]

“আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তোমরা একে অন্যের থেকে (এসেছ)”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৫]

আল-কুরআনে বর্ণিত শব্দ ‘তোমরা একে অন্যের থেকে (এসেছ)’ এর চেয়ে সমতা বিধানের আর কোনো উপযোগী শব্দ হতে পারে না। ইসলাম দাস-

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৫৯।

দাসীদের অধিকার প্রদান করেছে এবং মনিবকে তা পালন করতে অত্যাবশ্যকীয় করেছে। সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নোরূপ:

১- মালিক যে খাবার খাবে তাকেও একই জাতীয় খাবার খাওয়ানো।

২- মনিব যে মানের পোশাক পরিধান করবে তাকেও সে মানের পোশাক পরিধান করানো।

৩- সাধ্যানুযায়ী তাদেরকে কাজের আদেশ দেওয়া।

৪- তাদেরকে কোনো কাজের আদেশ দিলে নিজে সে কাজে তাদেরকে সাহায্য করা যাতে তাদের মনে প্রশান্তি পায় এবং কাজের চাপ কমে যায়।

৫- তাদেরকে প্রহার না করা।

৬- তাদেরকে তিরস্কার না করা।

৭- তাদেরকে মুসলিম ভাই হিসেবে মনে করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إن إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ».

“জেনে রেখো, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদের তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন নিজে যা খায় তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে, তাকে তা-ই পরায়। তাদের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না, যা তাদের জন্য খুব কষ্টকর। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সাহায্য করবে”।[1]

৮- তাদের পারিশ্রমিক কাজের সাথে সাথেই আদায় করে দেওয়া এবং এ ব্যাপারে টালবাহানা না করা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[1] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৬১।

«ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ».

“আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিবসে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো। এক ব্যক্তি যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে। আরেক ব্যক্তি, যে কোনো আযাদ মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। আর এক ব্যক্তি, যে কোনো মজুর নিয়োগ করে তার থেকে পুরো কাজ আদায় করে এবং তার পারিশ্রমিক দেয় না”।[1]

সতর্কীকরণ:

এ অধ্যয়ে অধিকাংশ হাদীস দাস-দাসী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। যদিও বর্তমানে দাস-দাসী প্রথা নেই। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী দাসপ্রথার বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াত অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে এ চুক্তি একাত্মতা ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]

“হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ১] অতএব, দাস-দাসীর ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশনার মধ্যে বাসা-বাড়ির কাজের লোক এবং উৎপাদন কাজে নিয়োজিত কর্মচারীরাও অন্তর্ভুক্ত।

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২২৭।

নবম অসিয়্যত: আমানত আদায়ের অসিয়্যত

১- ইমাম আহমদ রহ. তার মুসনাদে আবু হুররা আর-রিকাশী রহ. থেকে, তিনি তার চাচার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আইয়্যামে তাশরীকের দিনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতিরক্ষার জন্য তাঁর উটের লাগাম ধরে ছিলাম। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন, হে মানবকুল! (তিনি দীর্ঘ খুৎবা প্রদান করলেন)। এতে তিনি উল্লেখ করেছেন,

«أَلا وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا».

“সাবধান! কারো কাছে অন্যের আমানত থাকলে সে যেন তা আমানতদাতার কাছে দিয়ে দেয়”।[1]

২- ইমাম আহমদ, তিরমিযী, বায়হাকী ও তাবরানী উমামা আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজের ভাষণে বলতে শুনেছি,

«العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ».

“ধারের জিনিস তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে, যামিনদার প্রাপ্য পরিশোধের জিম্মাদার হবে, আর ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে”।[2]

ভূমিকা:

ইসলামী শরী‘আতে আমানত শব্দটি এমন ব্যাপক ও পরিব্যাপ্তি একটি শব্দ, যা প্রথম শ্রবণে যতটুকু বুঝা যায় তার চেয়েও ব্যাপক অর্থ প্রদান করে। ইমাম কুরতবী আল-মালেকী রহ. তার তাফসীরে নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨﴾ [المؤمنون : ٨]

---

[1] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২০৬৯৫।

[2] তিরমিযী, হাদীস নং ১২৬৫, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৩৯৮; মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২২৫০৭; সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাকী, হাদীস নং ১১৪৭৬; তাবরানী, হাদীস নং ৭৬২১।

“আর যারা নিজদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান”। [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৮] আমানত ও অঙ্গীকার মানুষের দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় কথা-বার্তা ও কাজ-কর্মকে শামিল করে। এ আমানত মানুষের যাবতীয় আচার-আচরণ, লেনদেন ও ওয়াদাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ আমানতের মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিকে রক্ষা করা। এ আমানতের বিশালতা ও গুরুত্বের কারণে পাহাড়-পর্বত, আসমান-জমিন এতো বড় সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও কুরআন বহন করতে অস্বীকার করে। আর এ মহান আমানত মানুষ গ্রহণ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَيۡنَ أَن يَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا ٧٢﴾ [الاحزاب : ٧٢]

“নিশ্চয় আমি আসমানসমূহ, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছি, অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং এতে ভীত হয়েছে। আর মানুষ তা বহন করেছে। নিশ্চয় সে ছিল অতিশয় যালিম, একান্তই অজ্ঞ”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭২]

এ কারণে আল্লাহ মানুষকে অতিশয় যালিম ও একান্তই অজ্ঞ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা সে বিশাল এক আমানত বহন করেছে। যদিও এ আমানত গ্রহণ করা সম্মান ও মর্যাদাকর; কিন্তু আমানতের যথাযথ হক আদায় করতে না পারা ও দায়িত্ব-কর্তব্যে অবহেলা করা অতিশয় যালিম ও অজ্ঞতার নামান্তর। উম্মতের মধ্যে আমানত আদায়ে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে। আমানতদারের আমানতকে আদায় না করে খিয়ানত করছে, কর্মচারীরা ও ভাড়াটিয়ারা চুক্তি অনুযায়ী কাজ না করে গাফলাতি করছে। এ জন্যই মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ সময়ে আমানতের ব্যাপারে কঠোরতা ও গুরুত্ব দিয়েছেন; বরং তিনি একথাও বলেছেন যে, উম্মতের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম আমানতকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةَ».

“তোমরা তোমাদের দীনের থেকে যে জিনিসটি সর্বপ্রথম হারাবে তা হলো আমানত”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপনীয়তা রক্ষাকারী হুযাইফা ইবন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কথা শুনুন। তিনি আমানত সম্পর্কে বলেছেন,

«حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ، رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ: حَدَّثَنَا: «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ» وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: " يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে দু’টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তর্মূলে অধোগামী হয়, তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করে, এরপর তারা নবীর সুন্নাহ থেকে জ্ঞান অর্জন করে” (অর্থাৎ এভাবে তাদের অন্তরের আমানত বৃদ্ধি পায়)। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আমানত তুলে নেওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, “যে ব্যক্তিটি (ঈমানদার) এক পর্যায়ে ঘুমানোর পর তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর মতো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় ঘুমাবে, তখন আবার উঠিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর তার চিহ্ন ফোস্কার

---

[1] মুসতাদরক হাকিম, হাদীস নং ৮৪৪৮। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

মত অবশিষ্ট থাকবে যেমন তোমার পায়ের উপর গড়িয়ে পড়া অঙ্গার সৃষ্ট চিহ্ন, যেটিকে তুমি ফোলা মনে করবে, অথচ তার মধ্যে আদৌ কিছু নেই। মানুষ লেনদেন করবে বটে; কেউ আমানত আদায় করবে না। তারপর লোকেরা বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক রয়েছে। সে ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে যে, সে কতোই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, কতই না বীর? অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না"।[1]

আমানতের ফযীলত:

যদি আমানত সম্পর্কে আলাদা কোনো ফযিলত বর্ণিত নাও হতো, তবুও আমানতদারের প্রতি মানুষের অন্তর স্বাভাবিকভাবেই ঝুকে পড়তো এবং এর প্রয়োজনীয়তার নিরিখে আমানতদারকে ভালোবাসতো ও সম্মান করতো। কেনই বা করবে না? এটি তো আল্লাহর আদেশ মান্য করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ [النساء : ٥٨]

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮]

এছাড়া আমানতদারীতা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ».

"যার মধ্যে আমানতদারীতা নেই তার ঈমান নেই"।[2]

নবী ও রাসূলগণ ছিলেন পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী। তারা সকলেই নিজ নিজ জাতির কাছে দাওয়াত দেওয়ার সময় বলেছিলেন,

﴿إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ ١٠٧﴾ [الشعراء : ١٠٧]

---

[1] মুত্তাফাকুন 'আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৩।

[2] তাবরানী আওসাত, হাদীস নং ২২৯২; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ১৯৪।

“নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল”। [সূরা আশ-শুআ‘রা, আয়াত: ১০৭]

আর এটিই ছিলো সর্বোত্তম যুগের (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তিন যুগের) মানুষের বৈশিষ্ট্য। ইমরান ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ».

“তোমাদের মধ্যে আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম, তারপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা, তারপর এদের পরবর্তী যুগের লোকেরা। তারপর এমন লোকেদের আবির্ভাব হবে, তারা সাক্ষ্য দিবে অথচ তাদের সাক্ষ্য চাওয়া হবে না, তারা খিয়ানতকারী হবে, তাদের আমানতদার মনে করা হবে না”।[1]

মুসলিমের জীবনে আমানতের অপরিসীম গুরুত্ব থাকায় ইসলামী শরী‘আত এ গুণে গুণান্বিত হতে নির্দেশ দিয়েছে এমনকি খিয়ানতকারীর সাথেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ».

“যে ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত রেখেছে তুমি তার সে আমানত আদায় করে দাও আর তোমার সঙ্গে যে খিয়ানত করেছে তার সাথে তুমি খিয়ানত করবে না”।[2]

আমানতের খিয়ানত করা মুনাফিকের আলামত:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে জানতে পারলাম যে, আমানত কীভাবে মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য; বরং শ্রেষ্ঠ মুমিন হলো পাক-

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪২৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩৫।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৫৩৪; তিরমিযী, হাদীস নং ১২৬৪। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।

পবিত্র মন ও উঁচু হিম্মতের অধিকারী হচ্ছেন আমানতদারগণ। এর বিপরীতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, রুগ্ন ও দুর্বল মনের অধিকারী হলো যারা খিয়ানতকারী ও গাদ্দার। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ».

“মুনাফিকের আলামত তিনটি: যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে”।[1]

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে,

«آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ».

“মুনাফিকের আলামত তিনটি যদিও সে সাওম পালন করে, সালাত আদায় করে আর মনে করে সে মুসলিম”।[2]

উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

«لَا يُعْجِبَنَّكُمْ مِنَ الرَّجُلِ طَنْطَنَتُهُ، وَلَكِنَّهُ مَنْ أَدَّى الْأَمَانَةَ، وَكَفَّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ، فَهُوَ الرَّجُلُ».

“কোনো ব্যক্তির গুঞ্জন ধ্বনিতে তোমাদেরকে যেন আশ্চর্য না করে; বরং যে ব্যক্তি আমানত আদায় করে এবং মানুষের সম্মান বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকে সেই মূলত পুরুষ”।[3]

---

[1] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৯।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৯।

[3] বায়হাকী, আস-সুনানুল আল-কাবীর, হাদীস নং ১২৬৯৫।

দশম অসিয়্যত:
ইয়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেওয়া

১- ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«يَوْمُ الخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الحَصْبَاءَ، فَقَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ يَوْمَ الخَمِيسِ، وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاَثٍ: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ، وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، سَأَلْتُ المُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ: فَقَالَ مَكَّةُ، وَالمَدِينَةُ، وَاليَمَامَةُ، وَاليَمَنُ، وَقَالَ يَعْقُوبُ وَالعَرْجُ أَوَّلُ تِهَامَةَ».

“বৃহস্পতিবার! হায় বৃহস্পতিবার! এরপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, এমনকি তাঁর অশ্রুতে (জমিনের) কঙ্করগুলো সিক্ত হয়ে গেলো আর তিনি বলতে লাগলেন, বৃহস্পতিবারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ যাতনা বেড়ে যায়। অবশেষে তিনি মারা যাওয়ার সময় তিনটি বিষয়ে অসিয়্যত করেন, মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত করো, প্রতিনিধি দলকে আমি যেরূপ উপঢৌকন দিয়েছি তোমরাও অনুরূপ দিও। (বর্ণনাকারী বলেন) তৃতীয় অসিয়্যতটি আমি ভুলে গিয়েছি। আবু আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, ইবন মুহাম্মাদ ও ইয়াকূব রহ. বলেন, আমি মুগীরা ইবন আব্দুর রহমানকে জাযীরাতুল আরব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তাহলো মক্কা, মদীনা ইয়ামামা ও ইয়ামেন। ইয়াকূব রহ. বলেন, তিহামা আরম্ভ হলো ‘আরজ থেকে”।[1]

হাদীসে উল্লিখিত ইয়ামেন দ্বারা মক্কার দক্ষিণাঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। এখানে ইয়ামান দ্বারা ইয়ামেন দেশ যার রাজধানী সান‘আ নির্দিষ্ট নয়, যা অচিরেই আগত ইমাম শাফে‘ঈ রহ.-এর কথায় স্পষ্ট বুঝা যায়।

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৫৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩৭।

২- ইমাম মুসলিম জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

«لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا».

“নিশ্চয় আমি ইয়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করবো, পরিশেষে মুসলিম ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে থাকতে দেবো না”।[1]

৩- ইমাম আহমদ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ অঙ্গীকার ছিলো,

«لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ ».

“আরব উপদ্বীপে একই সাথে দু’টি দীন অবশিষ্ট থাকতে পারে না”।[2]

আরব উপদ্বীপ ইসলামের আঙ্গিনা, দীনের প্রথম গৃহ ও মুসলিমের কিবলা। এখান থেকেই তাওহীদের আলো বিকিরণ ছড়িয়েছে এবং এ ভূমিতেই ইসলাম সর্বশেষে আশ্রয় নিবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا».

“অপরিচিতের বেশে ইসলাম শুরু হয়েছিল, অচিরেই তা আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে সাপ যেমন সংকুচিত হয়ে তার গর্তে প্রবেশ করে তদ্রূপ ইসলামও দুই মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে”।[3] এজন্যই সুউচ্চ প্রজ্ঞা ও হিকমত হলো আরব উপদ্বীপে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন অবশিষ্ট না থাকা; চাই কোনো ব্যক্তির অবশিষ্ট থাকা বা অন্য ধর্মের স্থাপনা বা সংস্থা অবশিষ্ট থাকা।

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৬৭।

[2] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৬৩৫২।

[3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৬।

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত জাযিরাতুল আরব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রায়, বর্তমান সৌদি আরবের সীমারেখা। ইমাম ইবন কুদামা 'আল-মুগনী' তে বলেন, "মদীনা ও তার আশ-পাশের এলাকায় কাফিরদের বসবাস করা নিষেধ আর তা হলো, মক্কা, ইয়ামামাহ, খাইবার, ইয়াম্বু', ফিদাক ও তার আশ-পাশের এলাকা।[1] এটি ইমাম শাফে'ঈ রহ. এর অভিমত। কেননা পূর্ববর্তী শাসক ও আলেমরা তাইমা ও ইয়ামান থেকে কাফির ও মুশরিকদেরকে উচ্ছেদ করেন নি"। অতঃপর ইবন কুদামা বলেন, "উক্ত হাদীস মোতাবেক জাযিরাতুল আরব বলতে হিজাযকে বুঝানো হয়েছে"।

ইমাম বায়হাকী 'মা'রিফাতুস-সুনান ওয়াল-আসার' এ বলেছেন, 'হিজায বলতে মক্কা, মদীনা, ইয়ামামা ও এর আশ-পাশের সমস্ত এলাকাকে বুঝায়। কেননা তাদেরকে হিজাযে বসবাসের অনুমতি দেওয়া রহিত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের অধিবাসীদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে এ শর্ত করেছেন যে,

«أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ».

"আল্লাহ তোমাদেরকে যতদিন অবশিষ্ট থাকার অনুমতি দিবেন ততদিন আমিও তোমাদেরকে তাতে বহাল রাখব"।[2] (অর্থাৎ তোমাদেরকে সাময়িকভাবে এ চুক্তির অধীন করা হলো, স্থায়ীভাবে নয়, কারণ আল্লাহ তোমাদেরকে বের করার নির্দেশনা দিলে তোমরা বের হয়ে যাবে)। অতঃপর কাফেরদেরকে হিজায থেকে উচ্ছেদ করার জন্য তিনি আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। এভাবেই ইমাম বায়হাকী রহ. আলোচনা আরো এগিয়ে নিলেন......। তিনি আরো বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাদেরকে উচ্ছেদ দ্বারা হয়ত স্থায়ীভাবে বসবাস না করাকে বুঝানো হয়েছে। আবার এটাও হতে পারে যে,

---

[1] কুরা ও হিজর ও তার আশেপাশের এলাকা।

[2] মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ৮৩১।

তিনি বলেছেন, "আরব ভূমিতে দু'টি দীন অবশিষ্ট থাকতে পারবে না"। এ হাদীস যদি সহীহ হয় তবে তাদেরকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্য হলো, আরবে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী দু'টি দীন থাকতে পারে না'।

ইমাম শাফে'ঈ রহ. বলেছেন, 'ইয়ামানের আহলে যিম্মাকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে কেউ একথা বলে নি, সেখানে যিম্মি ছিলো। ইয়ামেন হিজাযের অন্তর্ভুক্ত নয়'।

ইবনুল কাইয়্যেম রহ. 'আহকামু আহলিয যিম্মা' কিতাবে বলেন, 'কাফিররা হয়ত যুদ্ধকারী হবে অথবা চুক্তিবদ্ধ হবে। আর চুক্তিবদ্ধরা আবার তিন ধরণের: আহলে যিম্মা, আহলে হুদনা এবং আহলে আমান। তিনি আহলে আমান সম্পর্কে বলেন, "নিরাপত্তা প্রার্থী হলো: যে ব্যক্তি মুসলিমদের দেশে স্থায়ী বসবাস ব্যতীত সাময়িকভাবে বসবাসের জন্য আবেদন পেশ করে। তারা আবার চার প্রকারের: প্রতিনিধিদল, ব্যবসায়ী ও ভাড়াটিয়া। তাদের নিকট ইসলাম ও কুরআন পেশ করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে ইসলামে প্রবেশ করবে, আর ইসলাম গ্রহণ না করলে দেশে ফিরে যাবে। এর চতুর্থ প্রকার হলো ভ্রমণ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনাকারী। এ ধরণের লোকদের হুকুম হলো, তাদেরকে আক্রমণ করা যাবে না, হত্যা করা যাবে না ও তাদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না। সেখানে ভাড়ায় বসবাসকারীর নিকট ইসলাম ও কুরআন পেশ করা হবে। যদি তারা ইসলামে প্রবেশ করে তবে তো ভালো, আর যদি নিজের দেশে ফিরে যেতে চায় তাহলে নিরাপদে তাকে সেখানে যেতে দিতে হবে। সেখানে পৌঁছার আগে তার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করা যাবে না। তারা নিজ দেশে পৌঁছে গেলে তখন সে আহলে হরব তথা যুদ্ধকারী হিসেবে গণ্য হবে'।

আল্লামা ইবন উসাইমীন রহ. শরহে সহীহ মুসলিমে (পাণ্ডুলিপি) তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আহলে কিতাব ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে কর্মচারী হিসেবে কাজ

করানো যাবে কি? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তাদের দ্বারা কাজ করানো যাবে, তবে তাদেরকে স্থায়ীভাবে বসবাস ও নাগরিক করা যাবে না। জাযিরাতুল আরবে এটি করা নিষেধ। তবে তারা যদি ব্যবসা বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করে কাজ করে তাতে কোনো অসুবিধে নেই'।

এ মতের দলীল হলো ইবন খুযাইমা তার সহীহ ইবন খুযাইমাতে জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে বলেছেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا﴾

[التوبة: ٢٨]

"হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক, সুতরাং তারা যেন এ বছরের পর মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৮] উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় জাবির রা. বলেন, 'তবে দাস-দাসী বা আহলে যিম্মা হলে অসুবিধে নেই' অর্থাৎ তাদের সাথে মুসলিমের নিরাপত্তার চুক্তি রয়েছে। এখানে আহলে যিম্মা দ্বারা ফিকাহ শাস্ত্রের পরিচিত যিম্মী উদ্দেশ্য নয়। অতএব, হাদীসে উল্লিখিত ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে জাযিরাতুল আরব থেকে বের করে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, মুশরিকদেরকে জাযিরাতুল আরবে স্থায়ীভাবে আবাসন দেওয়া নিষেধ, তবে সাময়িকভাবে বাস করা বা ব্যবসা-বাণিজ্য করা ইত্যাদি নিষেধ নয়, যা বিদেশী কাফিররা জাযিরাতুল আরবে করে থাকে।

তাদেরকে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দেওয়া যেহেতু নিষেধ, সেহেতু অমুসলিমদের কোনো ধর্মীয় স্থাপনা বা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা আরো কঠোরভাবে নিষেধ যেমন, ইবাদতের গৃহ নির্মাণ, অমুসলিমের ধর্মীয় দাওয়াহ সেন্টার স্থাপন করা ইত্যাদি নিষেধ।

একাদশ অসিয়্যত: শির্ক ও এর যাবতীয় মাধ্যম থেকে সতর্ক করা

১- ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. আয়েশা ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তারা বলেন,

«لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর একটা চাদরে নিজ মুখমণ্ডল আবৃত করতে লাগলেন যখন শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো, তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন এমতাবস্থায় তিনি বললেন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে (এ বলে)। তারা যে (বিদ‘আতী) কার্যকলাপ করত তা থেকে তিনি সতর্ক করলেন”।[1]

২- ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণনা করেন, যে রোগ থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর সুস্থ হয়ে উঠেন নি সে রোগাবস্থায় তিনি বলেছেন,

«لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ، قَالَتْ عَائِشَةُ: «لَوْلاَ ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا».

“ইহুদীদের প্রতি আল্লাহ লা‘নত করেছেন, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, এরূপ প্রথা যদি না থাকত তবে তাঁর কবরকেও খোলা রাখা হতো; কারণ তাঁর কবরকেও মসজিদ (সাজদাহর স্থান) বানানোর আশংকা ছিল”।[2]

---

[1] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩১। .

[2] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২৯।

৩- ইমাম মুসলিম রহ. জুনদুব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে তাকে বলতে শুনেছেন,

«أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».

“সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও সৎলোকের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়েছিল। সাবধান! তোমরাও কবরকে মসজিদ বানিও না, আমি তোমাদের তা থেকে নিষেধ করছি”।[1]

৪- ইমাম বুখারী ও মুসলিম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণনা করেন, উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হাবশায় তাদের দেখা একটি গির্জার কথা বলেছিলেন, যাতে বেশ কিছু মূর্তি ছিল। তাঁরা উভয়ে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন,

«إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

“তাদের অবস্থা ছিল এমন যে, কোনো সৎলোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ বানাতো। আর তার ভিতরে ঐ লোকের মূর্তি তৈরী করে রাখতো। কিয়ামতের দিন তারাই আল্লাহর কাছে সবচাইতে নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে গণ্য হবে”।[2]

৫- ইমাম মুসলিম আবুল হাইয়্যাজ আল-আসাদী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩২।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪২৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২৮।

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ».

"আমাকে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবো না যে কাজে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হচ্ছে, কোনো (জীবের) প্রতিকৃতি বা ছবি দেখলে তা চূর্ন-বিচূর্ন না করে ছাড়বে না, আর কোন উঁচু কবর দেখলে তাও সমান না করে ছাড়বে না"।[1]

৬- ইমাম মুসলিম জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে আরো বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ».

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, কবরের উপর বসতে ও কবরের উপর স্থাপনা বানাতে নিষেধ করেছেন"।[2]

ভূমিকা:

আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে যে সব আদেশ দিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় আদেশ হলো তাঁর তাওহীদ, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা ও তাঁরই কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ﴾ [البينة: ٥]

"আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে"। [সূরা আয-যিলযাল, আয়াত: ৫] একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই সমস্ত নবী-রাসূল ও কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৬৮।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭০।

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ [الانبياء: ٢٥]

“আর তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল আমরা পাঠাই নি যার প্রতি আমরা এ অহী নাযিল করি নি যে, আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত করো”। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫]

পক্ষান্তরে সবচেয়ে বড় গুনাহ, মারাত্মক অপরাধ ও ধ্বংসাত্মক কবীরাহ গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শির্ক করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء : ٤٨]

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮]

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُ﴾ [المائدة: ٧٢]

“নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার ওপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৭২]

﴿وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥﴾ [الزمر: ٦٤]

“আর অবশ্যই তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে অহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি শির্ক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবেই। আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৪]

শির্ক এতো মারাত্মক হওয়ায় উম্মতের সত্যিকার নসীহতকারী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শির্ক, শির্কের যাবতীয় মাধ্যম ও যা কিছু শির্কের দিকে ধাবিত করে সব কিছু থেকে কঠোর হুশিয়ারী করেছেন।

শির্কের কারণ ও উপায়সমূহ:

শির্কের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর উপায়, কারণ ও যেসব জিনিস শির্কের দিকে ধাবিত করে তাহলো সালেহীনদের (সৎলোকদের) নিয়ে বাড়াবাড়ি বিশেষ করে মৃত সৎলোকদের নিয়ে বাড়াবাড়ি, তাদের কবরসমূহ উপাসনালয়ে পরিণত করা ও তাতে গৃহ নির্মাণ করা। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الجَنْدَلِ، وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ، وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ، عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الكَلاَعِ، أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ، أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ العِلْمُ عُبِدَتْ» .

"ওয়াদ 'দাওমাতুল জান্দাল' নামক স্থানে অবস্থিত কালব গোত্রের একটি দেবমূর্তি, সুও'আ হুযাইল গোত্রের একটি দেবমূর্তি এবং ইয়াগুস ছিল মুরাদ গোত্রের, অবশ্য পরবর্তীতে তা বনী গুতাইফ গোত্রের হয়ে যায়, যাদের আস্তানা ছিল, সাবার নিকটে 'জাওফ' নামক স্থানে। আর ইয়া'ঊক, তা তো ছিল হামাদান গোত্রের দেবমূর্তি। নাসর ছিল যুলকালা' গোত্রের হিমইয়ারীদের মূর্তি। এগুলো নূহ আলাইহিস সালামের জাতির কতিপয় সৎলোকের নাম ছিল। তারা মারা গেলে শয়তান তাদের জাতির লোকদের হৃদয়ে এই কথা ঢুকিয়ে দিল যে, তারা যেখানে বসে মজলিস করত, সেখানে তোমরা কিছু মূর্তি স্থাপন করো এবং ঐ সকল সৎলোকের নামানুসারেই এগুলোর নামকরণ করো। সুতরাং তারা তাই করল; কিন্তু তখনও ঐসব মূর্তির পূজা করা হতো না। তবে মূর্তি স্থাপনকারী লোকগুলো মারা গেলে এবং মূর্তিগুলো সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পূজা করতে শুরু করে দেয়"।[1]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯২০।

কুরআনে আল্লাহ মুশরিকদের যে লাতের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি মূলত একজন সৎলোক ছিলেন। তিনি হাজীদের জন্য খাদ্য তৈরি করতেন। তিনি মারা গেলে লোকেরা তার কবরে ঝুঁকে পড়ে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন,

«﴿أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ ١٩﴾ [النجم : ١٩] كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا يَلُتُّ سَوِيقَ الحَاجِّ».

"তোমরা লাত ও 'উয্যা সম্পর্কে আমাকে বলো? [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ১৯] এখানে 'লাত' বলে এ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে হাজীদের জন্য ছাতু গুলত"।[1]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, শির্কের অন্যতম কারণ ও উপকরণ হলো সৎলোকদের কবর স্থাপন করা, তাদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করা, তাদের কবরে ঘর নির্মাণ ও তাদের কবরসমূহ ইবাদতের স্থান করা ইত্যাদি। সৎলোকদের প্রতিমা স্থাপন, তাদের কবরের উপর গম্বুজ করা ও তাদের কবরসমূহ ইবাদতের স্থান স্থাপনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও হুশিয়ারী সম্পর্কে একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই, তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "কোনো প্রতিমা দেখলেই ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে, কোনো উঁচু কবর দেখলেই তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নির্দেশের হিকমত আমাদের সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে যখন বর্তমান বিশ্বে মুসলিম দেশের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে ও আহলে ইলমের এ ব্যাপারে নিষেধ করতে উদাসীনতা দেখলে, 'আদাত (রীতিনীতি) ও তাকালীদের (অন্ধ অনুসরণ) প্রভাব খুব স্পষ্ট হয়ে যায়। ফলাফল এ পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, এ সবের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে খুব অল্প লোকেরাই সতর্ক করে ও পরিবর্তনের চেষ্টা করে। ইমাম শাওকানী রহ. 'শরহে

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৫৯।

সুদূর’ কিতাবে বলেছেন, ‘কবর উঁচু করা, এতে গম্বুজ তৈরি করা, মসজিদ বানানো এবং একে দর্শনীয় করে তোলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এ সব কর্মকারীকে লা‘নত দিয়েছেন। তিনি আবার বলেছেন,

«اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

“আল্লাহর ভীষণ রাগ সেসব লোকের ওপর যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে”।[1] যারা নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ-দো‘আ করেছেন যে, তাদের এ মারাত্মক পাপের কারণে আল্লাহ তাদের ওপর ভীষণ রাগান্বিত হন। এটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আবার তিনি সেগুলোকে ধ্বংস করতে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। অন্যদিকে তিনি এসব কাজকে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আরো সতর্ক করে বলেছেন,

«لا تتخذوا قبري وثناً».

“তোমরা আমার কবরকে মূর্তি বানিও না”।[2]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا»

“তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিও না”।[3] অর্থাৎ কোন উৎসবের উপলক্ষ্য বানিও না, যেমনিভাবে অনেক লোক কবরকে উৎসবের উপলক্ষ্য বানায় এবং যারা বিশ্বাস করে যে, মৃতব্যক্তির অনেক শক্তি আছে। ফলে তারা কবরের পাশে একত্রিত হয়ে ইবাদাত করে এবং এতে সিজদা করে। নিঃসন্দেহে মৃতব্যক্তির শক্তির বিশ্বাসের মূল কারণ হলো শয়তান তাদেরকে এসব কিছু সুসজ্জিত করে

---

[1] মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ৫৯৩।

[2] মুসনাদে বাযযার, হাদীস নং ৯০৮৭।

[3] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৮৮০৪।

ধোঁকায় ফেলে দেয়। শয়তানের ধোঁকায় মানুষ কবরকে উঁচু করে, এতে সুন্দর পর্দা দেয়, কবরকে পাকা করে, একে চমৎকারভাবে সুসজ্জিত করে ও সুন্দরভাবে আলোকসজ্জা করে। ফলে অজ্ঞ লোকেরা যখনই এসব কবরের উঁচু উঁচু গম্বুজ দেখে তারা এতে প্রবেশ করে, এর চমৎকার গম্বুজ, পর্দা, রঙ-বেরঙয়ের আলোকিত বাতি ও চারিদিকে সাজানো সুগন্ধি দেখে তখন তাদের অন্তরে এসব কবরের প্রতি সম্মান সৃষ্টি হয়, তার স্মৃতিশক্তি এ মৃতব্যক্তির মর্যাদার কথা স্মরণ করে দুর্বল হয়ে যায় এবং তার মনে শয়তানী ভয়-ভীতি ঢুকে যায়, যা মুসলিমের জন্য শয়তানের সবচেয়ে মারাত্মক চক্রান্ত। সে ধীরে ধীরে বান্দাহকে পথভ্রষ্টের দিকে নিয়ে যায়। এমনকি পরিশেষে তার কাছে এমন সব কিছু চেয়ে বসে যা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কেউ দিতে পারে না। কখনো কখনো এ সব মাজার যিয়ারতের প্রথম দর্শনেই এ ধরণের শির্ক হয়ে যায়; কেননা তার মনে এ ধরণের ধারণা জন্মায় যে, জীবিত মানুষেরা এ মৃতব্যক্তির থেকে কোনো ফায়েদা ছাড়া আসে না; হয়ত তা দুনিয়াবী ফায়েদা বা আখেরাতের ফায়েদা। তখন সে ভাবে, এসব কবর এতবড় জ্ঞানী-গুণিরা যিয়ারত করে, এতে সাজদাহ করে ও কবরের খুঁটি ধরে দো'আ করে। এসব দেখে নিজেকে ছোট মনে করে। ফলে শির্কে লিপ্ত হয়।

শয়তান বনী আদমের শয়তানরূপী কিছু মানুষকে এসব কবরের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যিয়ারতকারীদেরকে ধোঁকায় ফেলে দেয়। তাদের কাছে ব্যাপারটি অনেক বড় করে তোলে এবং অবাক অবাক কাণ্ড ঘটিয়ে মৃতব্যক্তির দিকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে যা বিচক্ষণ ব্যক্তি ব্যতীত কেউ বুঝতে পারে না। কারামতের নামে অনেক মিথ্যা ও রূপকথার কাহিনী সাজিয়ে মানুষের মাঝে ছড়ায় এবং এসব মিথ্যাকথা নানা মজলিসে ও মানুষের সাথে দেখা হলেই বারবার উল্লেখ করে। ফলে তাদের কিছু ভক্ত ও অনুসারী তৈরি হয়ে যায়। যারা উক্ত মৃতব্যক্তির সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে তারা তার থেকে উপকার খোঁজতে

থাকে। তাদের সম্পর্কে যেসব মিথ্যা ও রূপকথার কাহিনী বর্ণনা করা হয় তা তাদের বিবেক খুব সহজেই মেনে নেয় এবং সে যেভাবে শুনেছে সেভাবেই আবার অন্যের কাছে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে বর্ণনা করে। এগুলো আলোচনা করার ফলে অজ্ঞ মানুষের মনে শির্কী বিশ্বাস জন্ম নেয়। ফলে তারা ধন-সম্পদ লাভের প্রত্যাশায় উক্ত মৃত ব্যক্তির নামে মান্নত করে এবং তার কবরের পাশে নিজেকে আটকে রাখে। কেননা সে ধারণা করে যে, উক্ত মৃতব্যক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে সেও অনেক কল্যাণ ও মহাপ্রতিদান লাভ করবে। সে বিশ্বাস করে, এভাবে করা হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, লাভজনক আনুগত্য ও কবুল হওয়া সাওয়াব। ফলে শয়তান তার অনুরূপ বনী আদমের থেকে ইচ্ছামত শয়তানী অর্জন করতে সক্ষম হয়। কেননা তারা এসব উদ্ভট, মিথ্যা ও বানোয়াট কাজ-কর্ম করে মানুষের কাছে বিষয়টিকে অনেক বড় করে তোলে। নানা রকম মিথ্যা কিচ্ছা-কাহিনী সাজিয়ে লোকদের থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ হাতিয়ে নেয়। এ ধরণের ভ্রষ্ট পদ্ধতিতে ও ইবলিসি কায়েদায় কবরের আশেপাশে অবস্থান করে বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করে”।

ইমাম আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইসমাঈল আস-সান‘আনী রহ. বলেছেন, ‘জেনে রেখো, এসব বিষয় (কবরপূজা) নিষেধের ব্যাপারে অনেক সতর্কীকরণ, সমালোচনা ও এসবের আস্তানা ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা চলছে। মূলতঃ এসব কাজ সে সমস্ত লোকদের দ্বারাই বেশী সংঘটিত হচ্ছে যারা কোনো দলীল-প্রমাণ ছাড়াই বাপ-দাদার দেখাদেখি ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণ ছাড়াই ইসলামের ওপর চলে আসছে। এদের কেউ নিজ গ্রামে-গঞ্জে শৈশব থেকেই এগুলো দেখে দেখে বড় হচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই এগুলোকে বিশ্বাসের নামে জয়গান গেয়ে বড় হচ্ছে। তারা তাদের বড়দেরকে দেখছে যে, তারা এসব মাজারে মান্নত করে আসছে, একে সম্মান করছে এবং তাদের ছেলে-সন্তানদেরকে নিয়ে মাজারে যাচ্ছে। ফলে বাল্য বয়স থেকেই ছোটদের

অন্তরে এ সবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা স্থির হয়ে যায়। তারা এগুলোকে সর্বাধিক সম্মানের জিনিস মনে করেন। ফলে এ ধরণের চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসে ছোটরা বেড়ে উঠে এবং এভাবেই বড় হচ্ছে। তারা এগুলোর বিরুদ্ধে কারো কোনো প্রতিবাদ ও নিষেধাজ্ঞা তো শুনেই নি; বরং দেখছে অনেক আলেম, বিচারক, মুফতি, শিক্ষক, দায়িত্বশীল, জ্ঞানী লোক, শাসক ও সরকার এসবের প্রতি অনেক বড় কিছু মনে করে খুব সম্মান দেখায়, মানত করে এবং কবরের জন্য জবাই করা পশুর গোশত ভক্ষণ করে। ফলে সাধারণ মানুষ এসব কাজকেই দীন ইসলাম মনে করেন এবং এগুলোকে দীনের মূল ও সুউচ্চ শিখর মনে করেন। এ ব্যাপারে কেউ চিন্তা-ভাবনা করে না। একমাত্র কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীসের জ্ঞানে জ্ঞানীরাই এসব সম্পর্কে জানেন। যদিও কোনো আলেমের এ ধরণের অন্যায় দেখে চুপ থাকা এগুলো জায়েয হওয়ার দলীল নয়; কেননা সব চুপ থাকা সন্তুষ্ট হওয়ার দলীল নয়। প্রকৃতপক্ষে এসব অন্যায়ের মূলহোতা অনেকাংশেই যাদের হাতে ঢাল-তলোয়ার রয়েছে সেসব (নেতৃস্থানীয় ও ক্ষমতাধর) লোক, মানুষের জীবন ও সম্পদ তাদের ক্ষমতা ও কলমের তলায় জিম্মি থাকে, লোকদের মান-সম্মান তাদের কথা ও বাক্যে থাকে। তাহলে নগণ্য কিছু লোক কীভাবে এগুলোর প্রতিবাদ করবে? এসব গম্বুজ ও দর্শনীয় জিনিসগুলো শির্কের সবচেয়ে বড় উপকরণ হিসেবে কাজ করে ইসলামকে ধ্বংস ও দীনের বুনিয়াদ নিশ্চিহ্নের সর্বোচ্চ মাধ্যম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যারা এগুলোর দেখাশুনা করে তারা রাজা-বাদশা, নেতৃস্থানীয় ও ক্ষমতাধর লোক। তারা হয়ত এসব মৃতব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন অথবা তার সম্পর্কে ভালো ধারণাকারী সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ বা আলেম বা সূফি বা ফকির বা বয়স্ক লোকজন। মৃতব্যক্তির এসব পরিচিতজনেরা তার যিয়ারতের জন্য তাদের কবরে আসে, যদিও তারা তখন কারো উসিলা তালাশ করে না বা তাদের নামে জয়ধ্বনি দেয় না। তারা শুধু তাদের জন্য দো‘আ করে। এভাবে সময়ের

পরিবর্তনে পরিচিত অনেকের কাছেই উক্ত মৃতব্যক্তির আসল নাম বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যায়। পরবর্তীতে এদের পরের প্রজন্মের লোকেরা সেখানে এসে কবরে গম্বুজ, মোমবাতি জ্বালানো, অনেক দামীদামী কার্পেট, পর্দা ও কবরের উপরে নানা রঙ বেরঙয়ের গোলাপ ও ফুল ছিটানো দেখতে পায়। ফলে আগত মানুষেরা মনে করেন, এসব কিছু উপকার সাধন ও ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য করা হয়। তার উপর আবার মৃতব্যক্তি সম্পর্কে কিছু মিথ্যাচারী আজগুবি গল্পকারীদের মিথ্যাচার যোগ হয়। তারা বলে বেড়ায় যে, অমুক লোক এই এই বিস্ময়কর কাজ করেছে। তার সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করার কারণে অমুকের এমন এমন ক্ষতি হয়েছে এবং ভালো মন্তব্য করার কারণে অমুকের এমন এমন কল্যাণ সাধিত হয়েছে। এভাবে তারা যিয়ারতকারীদের মনে যতসব বাতিল ধ্যান ধারণা জন্মে দেয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে বাতি জ্বালানো, এতে লেখা ও গৃহ নির্মাণকারীকে লা‘নত করেছেন। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এসব কাজ করা যেমন নিষেধ, তেমনি এসব কাজ নানা ফিতনা ফাসাদের পথ সুগম করে।

কেউ এখানে প্রশ্ন করতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের ওপর তো গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং এতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। জবাবে বলব: মূলত প্রকৃত অবস্থা না জানার কারণে কারো মনে এ ধরণের প্রশ্ন জাগতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের গম্বুজ তিনি, তাঁর সাহাবীগণ, তাবে‘ঈ, তাবে-তাবে‘ঈ বা এ উম্মতের কোনো আলেম নির্মাণ করেন নি; বরং এটি পরবর্তী যুগের কতিপয় রাজা-বাদশাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছে। এটি ৬৭৮ খৃস্টাব্দে মালিক মানসূর নামে খ্যাত ‘কালাউন আস-সালেহী’ নির্মাণ করেছেন। এটি মূলত রাষ্ট্রীয় কাজ ছিলো, যা পরবর্তী কারো জন্য দীনের অনুসরণযোগ্য কোনো দলীল হতে পারে না’।

ভারতীয় বিজ্ঞ আলেম শাইখ সিদ্দীক হাসান খান কানূজী রহ. বলেন, ‘যুগে যুগে সব দেশেই আলেমগণ মানুষকে তাওহীদে একনিষ্ঠ হতে ও সব ধরণের শির্ক থেকে দূরে থাকতে নির্দেশনা দিয়ে আসছেন। কিন্তু শির্ক যেহেতু পিঁপড়ার মন্থর গতির মতো গোপনভাবে চলে আসছে (যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন) তাই তা অনেক আলেমের কাছেও অস্পষ্ট ও অজানা। সঠিক ইলমের অভাবে ও অসাবধানতার কারণে অনেক আলেমরাও শির্কে পতিত হচ্ছে। এ ধরণের অসাবধানতা অনেক বিশিষ্ট আলেমের রচনাবলীতে ও অনেক কবির কবিতায় পাওয়া যায়। বিশেষ করে যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদা ও রাজা-বাদশাহর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। তাদের কবিতায় অসাবধানতা বশত এমন কিছু শির্ক পাওয়া যায় যা দেখলে শরীরের চামড়া শিহরে উঠে ও আত্মা প্রকম্পিত হয়। এ ধরণের রচনাবলীর লেখক তো দূরের কথা পাঠকের ওপরও আল্লাহর আযাব নেমে আসার আশঙ্কা করা হয়। এ ধরণের ভুল অনেক সময় কিছু লেখালেখিতে শুধু অমনোযোগিতা এবং অসাবধানতার কারণেই সঙ্ঘটিত হয় নি; বরং এর প্রধান কারণ হলো কবর পাকা করা, এতে গম্বুজ নির্মাণ, মূল্যবান পর্দা দিয়ে কবরকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করা, কবরে বাতি জ্বালানো, কবরের পাশে গেলে অতিভক্তি করে মাথা নত করা, মৃতব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া এবং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাদের কাছে দো‘আ করা।

এ জঘন্য কাজ পূর্বরর্তীদের থেকে পরবর্তীরা বংশ পরম্পরায় পেয়ে থাকে। তারা তাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করে। ফলে বিষয়টি প্রকোপ আকার ধারণ করে, অন্যায়টি দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। প্রতিটি অঞ্চলে, এমনকি প্রতিটি দেশ, শহর, গ্রাম ও সমাজে এ ধরণের মৃতলোক পাওয়া যায়। সে সমাজের একদল লোক মৃতব্যক্তির শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের কবরের পাশে লেগে থাকে। শির্ককারী এ জঘন্য

অপরাধীদের কাছে এটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, তাদের বিবেকসূলভ পরিচিত কাজ, তাদের মস্তিষ্ক এ কাজকে ভালো মনে করে এবং তাদের অন্তর একে প্রসার করে। এমনকি যখনই তাদের কোনো সন্তান জন্ম নেয় এবং তারা বুঝতে শিখে তখন তারা এ সব কবরের প্রতি আহ্বানকারীর আহ্বান শুনে। তারা এতে সাজদাহ ও যিয়ারত করতে আহ্বান করে। তারা দেখে, কেউ বিপদে পড়লে এসব কবরে কাছে বিপদমুক্তি প্রার্থনা করে, অসুস্থ হলে রোগমুক্তির জন্য মৃতব্যক্তির জন্য মানত করে, বিপদে-আপদে এসব কবরবাসীর উসিলা খোঁজে। নানা ফন্দি-ফিকিরে মানুষের সম্পদ ভক্ষণকারী কবরের ও এর আশেপাশে অবস্থানকারীদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের তারা তাদেরকে দান-সদকা করে। এভাবে যখন শিশুরা বড় হয় এবং মানুষের কাছে এসব কাহিনী শোনে ও সচক্ষে দেখে তখন তা তাদের মস্তিষ্কে ও চিন্তা-চেতনায় স্থির হয়ে যায়। কেননা ছোটদের স্বভাবই হলো কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত হওয়া। একটু বড় হলে যখন সে তার পিতামাতা ও মুরুব্বীদের থেকে আলাদা হয়ে বাহিরের জগতে যায় তখনও সে দেখে যে, অন্যান্য মানুষও তার পিতামাতার মতই একই কাজ করে। অনেক ঘটনা শোনা যায় যে, ভূমিষ্ঠ শিশুর বাইরের জগতে সর্বপ্রথম ভ্রমনের স্থান ও দর্শনীয় জায়গা হলো ঐ সব ভ্রান্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী মাজারসমূহ, যারা কারণে মানুষ আজ মহাপরীক্ষার সম্মুখীন ও সংকটাপন্ন। সে সেখানে পিতামাতা ও গুরুজন থেকে মানুষে ভীড়, শোরগোল, চিৎকার, চেঁচামেচি ও দো'আ করা ইত্যাদি দেখতে পায়। ফলে তার পিতামাতা থেকে প্রাপ্ত বিশ্বাসটি আরো সুদৃঢ়, মজবুত, স্থায়ী ও শক্তিশালী হয়। বিশেষ করে যখন সে কবরে মূল্যবান নির্মাণ, দেওয়ালগুলো রঙ বেরঙয়ের কারুকার্য খচিত, এতে ঝুলে আছে মূল্যবান পর্দা, চারিদিকে আছে 'উদ ও মিশক আম্বার সাজানো দামী দামী সুগন্ধি, চতুর্দিকে আলোকসজ্জা, মোমবাতি, আগরবাতি; এর সাথে আবার নানা কৌশলে মানুষের সম্পদ ভক্ষণকারী সেসব কবরে অবস্থানকারীর নানা

আজগবি গল্প শুনে, তখন সে দেখতে পায় যে, মানুষ এসবের প্রতি যথাসম্ভব সম্মান ও মর্যাদা দেয়। ফলে এসবের ভয়-ভীতি মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। যিয়ারতকারীরা ও ভ্রমণকারীরা সেসব স্থানে হাত বেঁধে ও সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে আসতে থাকে। তারা সামান্য বেয়াদবিও করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে এসব কবরের প্রতি গরিব-মিসকীনদের বিশ্বাস বাড়তে থাকে। তাদের অন্তরে ভ্রান্ত আকীদা সুদৃঢ়ভাবে স্থায়ী হয়ে যায়, যা আল্লাহর তাওফিক, হিদায়াত, দয়া ও হেফাযত ছাড়া দূর হয় না।

আর তখন ইলম অন্বেষণকারী কচিকাঁচা ছাত্ররা দেখে যে, তথাকথিত আহলে ইলমের অধিকাংশরাই মৃতব্যক্তি সম্পর্কে এ ধরণের বিশ্বাস রাখেন। তারা দেখতে পায় যে, আলেমগণ এসব মৃতব্যক্তিকে সর্বোচ্চ সম্মান দেখায় এবং এদের ভালোবাসা আল্লাহর অশেষ নি‘আমতের ভাণ্ডার মনে করেন। আর যারা এসব ভ্রান্ত কাজের সমালোচনা করেন তাদেরকে অভিসম্পাত দিয়ে থাকেন। এরা বলে বেড়ায়, এ লোকটি আল্লাহর অলীদের প্রতি বিশ্বাসী নয় এবং তাদেরকে ভালোবাসে না। ফলে তালিবে ইলমের অন্তরে এদের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং এসব বিশ্বাস সুদৃঢ়ভাবে স্থায়ী হয়।

এসব মারাত্মক বিদ‘আত ও ভয়ঙ্কর ফিতনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্রে ছড়িয়ে আছে। অনেক মানুষই মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে এসব ভ্রান্ত আকীদায় বিশাসী। অবস্থা এতোই শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা কবর পাকা করা, এতে মূল্যবান গম্বুজ নির্মাণ, কবর যিয়ারতকারীদের জন্য একে এমনভাবে ভীতিকর ও আকর্ষণীয় করে তোলা যাতে একে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া অত্যাবশ্যকীয় হয় ইত্যাদি কর্ম করাকে ঈমানের মৌলিক ও ইসলামের সর্বোচ্চ সহযোগিতা মনে করে। এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, জ্ঞানী-গুণীরা এসবের বিরোধিতা করতে সক্ষম হচ্ছে না। এ ফিতনায় পড়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো তাওহীদে ইখলাস না থাকা।

উপরোক্ত আলোচনার ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করলে এবং তা বিবেকপ্রসূত মনে না হলে তাকে এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিসংখ্যান করে দেখতে অনুরোধ করছি। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের অধিকাংশ ফলাফলই এমন হবে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রায় সবাই উপরোক্ত ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসে বিশ্বাসী।

কানূজী রহ. একথা বলে উপসংহার টানেন যে, "পরিশেষে বলব, পূর্ববর্তী কিতাব, কবিতা, খুৎবা ও পুস্তিকায় যেসব নাজায়েয আকীদা ও বিশ্বাস পাওয়া যায় সেগুলোর বাস্তবতা ও সঠিকতা নিরূপণ করবো, এতে যা আছে তা মানুষের কাছে তুলে স্পষ্ট করবো এবং এগুলোর আমল থেকে দূরে থাকার জন্য সাধারণ মানুষকে সতর্ক করবো। এগুলো যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করে সঠিকটা গ্রহণ করবো এবং লেখকের পরিণতি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিবো। বিবেক ও জ্ঞান যা প্রত্যাখ্যান করে এমন সব ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে অজুহাত ও ক্ষমা পেশ করবো। এর বেশী আল্লাহ আমাদেরকে দায়িত্ব দেন নি এবং আমরা এর বেশী নিজেদের ওপর অত্যাবশ্যকীয়ও করে নিবো না। (এখানে ইমাম কানূজী রহ. এর কথা শেষ)'।

পাঠক উপরোক্ত কথাগুলো চিন্তা করলে তার কাছে শির্ক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়্যতের গুঢ় রহস্য এবং এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যধিক গুরুত্ব প্রদানের কারণ স্পষ্ট হয়ে যাবে।

অষ্টম শতাব্দিত এক আলেম এ সম্পর্কে বলেছেন, একমাত্র আল্লাহ যাকে হিফাযত করেন সে লোক ব্যতীত অনেকেই শয়তানের এ বড় চক্রান্তে পতিত হয়। কবরের এ ফিতনা সম্পর্কে আল্লাহ পূর্বযুগে ও পরবর্তীযুগে অহী নাযিল করেছেন। অবস্থা এতই শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এসব লোকের ইবাদাত করতো। তারা মারা গেলে তাদের কবরে পূজা

করতো, কবরকে মূর্তি বানাতো, এতে গৃহ নির্মাণ করতো, এসব লোকের প্রতিকৃতি বানাতো, অতঃপর এসব প্রতিকৃতিতে শরীরের আবরণ দিতো, অতঃপর একে প্রতিমা হিসেবে গ্রহণ করতো এবং আল্লাহর সাথে এদেরও ইবাদাত করতো। এ মহাভয়ঙ্কর কাজটি সর্বপ্রথম করেছে নূহ আলাইহিস সালামের জাতিরা। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আল-কুরআনে বলেছেন, ﴿قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَارًا ٢١ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ٢٢ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ٢٣ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًاۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا ضَلَٰلًا ٢٤﴾ [نوح: ٢١، ٢٤]

"নূহ বলল, হে আমার রব! তারা আমার অবাধ্য হয়েছে এবং এমন একজনের অনুসরণ করেছে যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়। আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে। আর তারা বলে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের বর্জন করো না; বর্জন করো না ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'ঊক ও নাসরকে। বস্তুত তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, আর (হে আল্লাহ) আপনি যালিমদেরকে ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়াবেন না"। [সূরা নূহ, আয়াত: ২১-২৪]

ইবন জারীর রহ. বলেছেন, নিম্নোক্ত বর্ণনাকারীদের থেকে আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে, আমাকে ইবন হুমাইদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার কাছে মিহরান হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার কাছে সুফিয়ান, তিনি মূসা এবং তিনি মুহাম্মাদ ইবন কায়েস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইয়াগুস, ইয়া'ঊক ও নাসর বনী আদমের তিনজন সৎব্যক্তি ছিলেন। তাদের কিছু অনুসারী ছিলো তারা তাদের অনুসরণ করত। অতঃপর তারা যখন মারা যায় তখন তাদের অনুসারীরা বললো, আমরা যদি এদের ছবি অংকন করে রাখি তাহলে যখন এদের কথা স্মরণে পড়বে তখন আমরা ইবাদাতের প্রতি বেশি আসক্ত হবো। তাই তারা এদের ছবি আঁকলো। এরা মারা গেলে এদের পরবর্তী লোকদের

কাছে শয়তান এসে ধোঁকা দিতে লাগল। সে তাদেরকে বললো, তোমাদের পূর্বের লোকেরা তো এদের ইবাদাত করতো। তারা তাদের অসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতো। ফলে এরাও তাদের ইবাদাত করতে শুরু করলো।[1]

ইমাম শাওকানী রহ. বলেছেন, কবর উঁচু করা, এতে চুনকাম করা, বাতি জ্বালানো ইত্যাদি কাজ থেকে শরী'আত প্রণেতার ধমক ও সতর্কের পূর্ণ প্রজ্ঞা সম্পর্কে ভেবে দেখুন। আমি সবচেয়ে আশ্চর্যান্বিত হই যখন দেখি তাদের সত্যবাদী ও সত্যায়িত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে এ ধরণের কাজ থেকে ধমক ও সর্বাত্মক সতর্ক করেছেন, এমনকি তিনি তাঁর মৃত্যুর সময়ও বলেছেন,

«لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» .

"ইহুদীদের প্রতি আল্লাহ লা'নত করেছেন তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে"। [2]

এতকিছু সত্ত্বেও পৃথিবীর সব প্রান্তে, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে সর্বত্র এ শির্কটি ছড়িয়ে আছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজি'উন।

শাওকানী, সান'আনী ও কানূজীর মতো বিজ্ঞ আলেমগণ কবরে গৃহ নির্মাণ এবং কবরকে মসজিদে পরিণত না করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়্যত অমান্য করার ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছেন তা বাস্তব ও লক্ষণীয় ব্যাপার। অনেক সাধারণ মুসলিম ও অজ্ঞরা না জেনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আদেশের বিরোধিতা করে শির্কে পতিত হচ্ছে। এর চেয়েও মারাত্মক হচ্ছে এদের অনেকেই সৎ বান্দার কবরে গিয়ে তাদের কাছে উপকার সাধন ও ক্ষতি থেকে রক্ষা চেয়ে দো'আ করছে। কেউ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ চিন্তা করলে দেখতে পাবে, একনিষ্ঠভাবে

---

[1] তাফসীরে ত্বাবারী, ২৩/৬৩৯।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২৯।

আল্লাহর কাছে দো‘আ করাকে তাওহীদ আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দো‘আ করাকে শির্ক বলা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَدۡعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٠﴾ [الجن: ٢٠]

“বলুন, নিশ্চয় আমি আমার রবকে ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না”। [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ২০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ إِذَا هُمۡ يُشۡرِكُونَ ٦٥﴾ [العنكبوت: ٦٥]

“তারা যখন নৌযানে আরোহন করে, তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে স্থলে পৌঁছে দেন, তখনই তারা শির্কে লিপ্ত হয়”। [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৬৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠﴾ [غافر: ٦٠]

“আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকার বশতঃ আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে”। [সূরা গাফের, আয়াত: ৬০]

মুফাসসিরগণ আয়াতে বর্ণিত ﴿عِبَادَتِي﴾ দ্বারা “আমার কাছে দো‘আ” বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمۡلِكُونَ كَشۡفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمۡ وَلَا تَحۡوِيلًا ٥٦ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا ٥٧﴾ [الاسراء: ٥٦، ٥٧]

“বলুন, তাদেরকে ডাক, আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে (উপাস্য) মনে করো। তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। তারা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের রবের কাছে নৈকট্যের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে তাঁর নিকটতর? আর তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার রবের আযাব ভীতিকর”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৬-৫৭]

‘যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে’-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেছেন, তারা হলেন আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণ, ঈসা আলাইহিস সালাম ও ‘উযাইর আলাইহিস সালাম, যাদেরকে মুশরিকগণ ডেকে থাকেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦ وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يُرِدۡكَ بِخَيۡرٖ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهِۦۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٧﴾ [يونس : ١٠٦، ١٠٧]

“আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব, তুমি যদি করো, তাহলে নিশ্চয় তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো ক্ষতি পৌঁছান, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোন প্রতিরোধকারী নেই। তিনি তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬-১০৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿قُلۡ أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنۡ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلۡ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوۡ أَرَادَنِي بِرَحۡمَةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَٰتُ رَحۡمَتِهِۦ ٣٨﴾ [الزمر: ٣٧]

“বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ- আল্লাহ আমার কোনো ক্ষতি চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমাকে রহমত করতে চাইলে তারা সেই রহমত প্রতিরোধ করতে পারবে?”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩৭]

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ».

“দো‘আ হলো ইবাদাত”। [1]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

«الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ».

“ইবাদাতের সারবস্তু হলো দো‘আ”।[2]

তাওহীদ ও শির্কের সাথে দো‘আর সম্পৃক্ততা এভাবে প্রকাশ পায় যে, মানুষ যখন উপকার সাধন বা ক্ষতি থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দো‘আ করে তখন জানে ও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তার কথা শোনেন, তার অবস্থা জানেন, তিনি তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম এবং একই সময়ে আল্লাহ অন্যান্যদের কথাও শোনেন, তাদের অবস্থা জানেন; এতে আহ্বানকারীর সংখ্যা যতই হোক, তারা যে ভাষাভাষী হোক এবং তাদের প্রয়োজন যে কোন ধরণেরই হোক। আর মানুষ যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডাকে, বা তার কাছে দো‘আ করে, যেমন, খৃস্টানরা তাদের কিদ্দীসদেরকে (সাধক) বা মারইয়াম আলাইহাস সালামকে ডাকে বা কিছু অজ্ঞ মুসলিমরা তাদের দো‘আয় কবরবাসীকে ডাকে ও তার কাছে উপকার সাধন ও ক্ষতি থেকে মুক্তি চায়, তারা এ অবস্থায় এ ধরণের কাজ এ বিশ্বাসে করে যে, তারা যাকে ডাকছে

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪৭৯; তিরমিযী, হাদীস নং ২৯৬৯। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] তিরিমিযী, হাদীস নং ৩৩৭১। তিনি হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।

তারাও তাদের কথা শোনে, তাদের অবস্থা জানে, তাদের অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে তারা অবগত, এমনিভাবে তারা অন্যদের দো‘আও শোনে, তাদের অবস্থা জানে এবং তাদের অন্তরের সব কিছু তাদের অবগত, এমনিভাবে অন্যদের সংখ্যা যতই বেশি হোক না কেন, তারা যে ভাষাভাষীই হোক না কেন, তাদের প্রয়োজন যাই হোক না কেন এবং তারা যতই দূরত্বে থাকুক তাদের দো‘আও ওরা শোনে ও তাদের অবস্থাও ওরা জানে। (সুতরাং এভাবে তারা আল্লাহর বহু সমকক্ষ সাব্যস্ত করছে)

খৃস্টান ও কিছু অজ্ঞ মুসলিমরা এ বিশ্বাসে আল্লাহর কিছু গুণাবলীকে তার সৃষ্টজীবের জন্য সাব্যস্ত করে এবং স্রষ্টার কিছু ইবাদাতকে সৃষ্টজীবের প্রতি নিবদ্ধ করে। আর এসব কিছুই তাওহীদের বিপরীত। খৃস্টান ও কিছু অজ্ঞ মুসলিমের এ অজুহাত কোনো কাজে আসবে না যে, তারা বলেন, আমরা মারইয়াম আলাইহাস সালাম, বা কিদ্দীস (সাধক) বা আওলিয়া বা সালেহীনরা এককভাবে উপকার সাধন বা ক্ষতি দূর করতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করি না; বরং আমরা তো তাদেরকে শুধু আল্লাহ ও আমাদের মাঝে উসিলা মনে করি। কেননা আল্লাহ তাদের এ অজুহাত খণ্ডন করে স্পষ্টভাবে বলেছেন,

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾ [الزمر: ٣]

“আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ﴾ [يونس : ١٨]

“আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, এরা আল্লাহর

নিকট আমাদের সুপারিশকারী”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮] অথচ আল্লাহ এদের সম্পর্কে বলেছেন, এরা নিজেরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভ, তার রহমতের প্রত্যাশা ও আযাবকে ভয় পায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمۡلِكُونَ كَشۡفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمۡ وَلَا تَحۡوِيلًا ٥٦ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا ٥٧﴾ [الاسراء: ٥٦، ٥٧]

“বলুন, তাদেরকে ডাক, আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে (উপাস্য) মনে কর। তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। তারা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের রবের কাছে নৈকট্যের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে তাঁর নিকটতর? আর তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার রবের আযাব ভীতিকর”। [সূরা : আল-ইসরা, আয়াত: ৫৬-৫৭]

আল্লাহ তা‘আলা জাহেলী যুগের খৃস্টান ও আরবের মুশরিকদের সম্পর্কে আল-কুরআনে বলেছেন যে, তারা মারইয়াম আলাইহাস সালাম, কিদ্দীস (পুণ্যাত্মা), ফিরিশতা ও মূর্তির এজন্য অসিলা তালাশ করে যে, এগুলো তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে ও আল্লাহর সামনে সুপারিশ করবে। তারা সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির সময় এদেরকে ডাকে; কিন্তু বিপদাপদে একমাত্র আল্লাহকেই একনিষ্ঠভাবে ডাকে, দো‘আর সময় তারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো সৃষ্টজীবকে শরীক করেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ إِذَا هُمۡ يُشۡرِكُونَ ٦٥﴾ [العنكبوت: ٦٥]

“তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে, তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে স্থলে পৌঁছে দেন, তখনই তারা শির্কে লিপ্ত হয়”। [সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ৬৫]

আল্লাহ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে আরো বলেছেন,

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمۡ فِي ٱلۡفُلۡكِ وَجَرَيۡنَ بِهِم بِرِيحٖ طَيِّبَةٖ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتۡهَا رِيحٌ عَاصِفٞ وَجَآءَهُمُ ٱلۡمَوۡجُ مِن كُلِّ مَكَانٖ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ أُحِيطَ بِهِمۡ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [يونس : ٢٢]

“এমনকি যখন তোমরা নৌকায় থাক, আর তা তাদেরকে নিয়ে চলতে থাকে অনুকূল হাওয়ায় এবং তারা তা নিয়ে আনন্দিত হয়, (এ সময়) তাকে পেয়ে বসে ঝড়ো হাওয়া, আর চারদিক থেকে ধেয়ে আসে তরঙ্গ এবং তাদের নিশ্চিত ধারণা হয় যে, তাদেরকে পরিবেষ্টন করা হয়েছে। তখন তারা আল্লাহকে ডাকতে থাকে, তাঁর জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ২২] যখন দেখি কতিপয় অজ্ঞ মুসলিম বিপদাপদ ও সচ্ছলতার সময় কবরবাসী এবং অদৃশ্য অলী ও সালেহীনদের ডাকে তখন অন্তর দুঃখে ভরাক্রান্ত হয়ে যায়।

এর চেয়েও আশ্চর্য হলো আল্লাহ তা‘আলা জাহেলী যুগের মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা একথা জানেন, রিযিক, ক্ষতি, উপকার, কোনো কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটানো ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١﴾ [يونس : ٣١]

“বলুন, আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদের রিযিক দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। সুতরাং, আপনি বলুন, তারপরও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩১]

তা সত্ত্বেও আমরা দেখি, কিছু অজ্ঞ মুসলিম আল্লাহর সৃষ্টজীব কবরবাসী ও সালেহীন বান্দাহকে তার সাথে সম্পৃক্ত করে। কেউ আবার তাদেরকে ক্ষতি, উপকার, রিযিক, অভাব মিটানো, বিশ্ব পরিচালনা, ইলমে গায়েব ইত্যাদির জন্য তাদেরকে 'আবদাল' (সম্পূরক ক্ষমতার অধিকারী) ও 'আকতাব' (কুতুব বা চুম্বক ক্ষমতার অধিকারী) নামে অভিহিত করেন। বরং এ ধরণের ভ্রান্ত আকীদা কিছু আলেম; বিশেষ করে তাদের 'অলিদের কারামত' সংক্রান্ত কিতাবসমূহে দেখতে পাওয়া যায়।

অথচ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী, রাসূলদের সর্দার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার রব আদেশ দিয়েছেন,

﴿قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ٢١﴾ [الجن: ٢١]

"বলুন, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য না কোন অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখি এবং না কোন কল্যাণ করার"। [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ২১]

আল্লাহ তা'আলা তাকে আরো বলেছেন,

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُ﴾ [الاعراف: ١٨٧]

"বলুন, 'আমি আমার নিজের কোন উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না; তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোনো ক্ষতি স্পর্শ করত না"। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৮৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ﴾ [الانعام: ٥٠]

"বলুন, তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি না"। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৫০]

কিছু অজ্ঞ মুসলিম এ ধরণের ভুল-ভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার কারণ হলো কতিপয় আলেমদের অসচেতনতা, তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ, রীতিনীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী হুকুম দেওয়া এবং সেসব লেখকদের বইসমূহ কুরআন ও হাদীসের মানদণ্ডে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে শুধু সুধারণা বশতঃ তা গ্রহণ করা। সাধারণ মুসলিমদের অজ্ঞতার অজুহাতে একথা বলা যায়; কিন্তু যারা নিজেকে আলেম দাবী করে তাদের কী ওযর থাকতে পারে? আর রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের ব্যাপারে বলা যায়, যখন কুসংস্কার বৃদ্ধি পায় তখন অনুভূতি কমে যায়। আমরা দেখি, খুব অল্প সংখ্যক ইসলামী আন্দোলনের লোকেরাই (যদিও তারা ইলম ও প্রজ্ঞা অবলম্বন করে) এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় অথচ শির্ক মুক্ত হওয়া ইসলামের মৌলিক বিষয় এবং প্রথম রুকন। সুতরাং ‘লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ’ (আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সৎকার করা বা খারাপ কাজ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই)।

এখানেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কবরে গৃহ নির্মাণ করতে নিষেধ করা, একে সমান করার নির্দেশ দেওয়া এবং কবরকে সালাতের স্থান না বানানোর আদেশের অসিয়্যতের প্রজ্ঞা স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা এসব কিছু কবরপূজারীদের ফিতনায় টেনে নেয় এবং এসব কাজ থেকে বেঁচে থাকা হলো সবচেয়ে বড় তাওহীদ ও আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদাত। আল্লাহই সাহায্যকারী।

শির্কের কিছু নমুনা:

শির্কের নানা ধরণের হতে পারে। উপদেশ দানকারী এ লেখক নিজেই শির্ক থেকে মুক্ত থাকতে আপ্রান চেষ্টা করে এবং এর সমস্ত পথ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক মুসলিমই কোনটি শির্ক আর কোনটি না এ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে না। ফলে তারা না জেনে শির্কে পতিত হচ্ছে। শির্কের কিছু নমুনা এখানে পেশ করা হলো:

১- জীবিত বা মৃত আওলিয়া ও সালেহীনের নামে জবেহ করা।

২- তাদের নামে মান্নত করা।

৩- বিপদাপদ ও অভাব পূরণের জন্য তাদের কাছে দো‘আ করা।

৪- বান্দা ও আল্লাহর মাঝে তাদেরকে মাধ্যম ও অসীলা বা মানা।

৫- তাদের কবরসমূহকে সম্মানার্থে ঈদ তথা সম্মিলনস্থল ও মাযার তথা যিয়ারাতস্থল বানানো।

৬- তাদের থেকে কিছু আশা করা ও তাদেরকে ভয় করা।

সতর্কীকরণ:

এ অধ্যয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। এর কারণ হলো:

প্রথমত: শির্কের ভয়াবহতার কারণে। কেননা শির্ক ইসলামের মূলভিত্তি তাওহীদকে ধ্বংস করে দেয় এবং আল্লাহর কাছে মুসলিমের আলম নষ্ট করে দেয়। এ বিষয়ে সব ধরণের পথ ও পদ্ধতি বন্ধে সতর্ক করা অত্যাবশ্যক। ইতিহাস সাক্ষ্য যে, শির্কের সর্বাধিক উপায় হলো সালেহীনদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা, তাদের কবরকে ইবাদাত ও আনন্দ-উল্লাসের স্থান বানানো, তাদের কবরকে সম্মান দেখাতে পাকা করা ও এতে গম্বুজ ও গৃহ নির্মাণ করা।

দ্বিতীয়ত: শির্কের যাবতীয় উপায় সতর্ক করতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক আগ্রহ দেখানো। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ জীবনে কবরকে ইবাদতের স্থান বানাতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি মারা যাওয়ার পাঁচ দিন পূর্বে এ সম্পর্কে আবারো সতর্ক করেছেন। অতঃপর তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তেও কবরকে পাকা করা ও এতে গৃহ নির্মাণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং কেউ এরূপ করে থাকলে তা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।

তৃতীয়ত: মুসলিম দেশে ব্যাপকভাবে এ মুসিবত পরিলক্ষিত হওয়া; এমনকি ইসলামী বিশ্বের এমন কোনো দেশ পাওয়া যাবে না যেখানে এ ফিতনা প্রবেশ করে নি।

চতুর্থত: এ ব্যাপারে অনেক সংস্কারকদের গুরুত্বহীনতা ও অসচেতনতা। অথচ এটা তাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম কাজ ও সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিলো।

মুসলিমদের মধ্যে এ জঘন্য কাজটি ব্যাপক হারে দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ হলো মিসরে ফাতেমী শাসনামলের রাজা-বাদশাহদের চাল-চলন ও আচার-আচরণে এ কাজটি দেখা দিয়েছিলো। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, শক্তি ও সামর্থ্যের কারণে কোনো কাজ ব্যাপক হয়। আর এ শক্তি-সামর্থ কাজটি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে সে সময় এ ধরণের নিকৃষ্ট মজলিশ বসতো। সে সব হালকায় অন্যায়কে ন্যায় ও ন্যায়কে অন্যায় বানাতো। অন্যদিকে সে সময় ফতওয়া প্রদানকারী সংস্কারকদের কণ্ঠও হারিয়ে গিয়েছিলো। যদিও নানা দেশ ও স্থান থেকে অনেক আলেম এ মুসিবত সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলেছেন যেমনিভাবে তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছিলেন। আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী।

আরেকটি সতর্কীকরণ:

কেউ শির্ক বা কুফরী কাজ করলেই তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেওয়ার হুকুম দেওয়া যাবে না বা তার সাথে কাফির ও মুশরিকের মতো আচরণ করা যাবে না। কারণ একথা সর্বজন বিদিত যে, এ ধরণের শির্কী কাজে লিপ্ত অজ্ঞ মুসলিমকে যদি কাফের হওয়া ও মারা যাওয়া এ দু'টি অপশনের মধ্যে কোনো একটিকে বাছাই করতে সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে সে কাফির হওয়ার চেয়ে

মারা যাওয়াকেই নির্বাচন করবে। বরং এ ধরণের শির্কী কাজে লিপ্ত অনেক লোক এমনও আছে অন্যান্য প্রকৃত মুসিলমদের মতই এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং তারা ঈমান রাখে যে কুরআন সত্য।

আসলে তারা অজ্ঞতা ও না জানার কারণে তাওহীদ পরিপন্থী কাজে লিপ্ত হচ্ছে। অতএব, আমাদের ওপর দায়িত্ব হলো এ ধরণের অজ্ঞ ও অসতর্ক লোকদেরকে পথ দেখানো।

ভয়ঙ্কর মূল সমস্যা হলো তাদের নিয়ে যারা এ সম্পর্কে অবগত এবং কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে যেসব নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেগুলো জেনেও এর ওপর অটুট থাকে এবং মানুষকে এর হুকুম সম্পর্কে বলে না। নিম্নোক্ত আয়াতই তাদের সতর্কতার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ١٥٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠﴾ [البقرة: ١٥٩، ١٦٠]

“নিশ্চয় যারা গোপন করে সু-স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হিদায়াত যা আমি নাযিল করেছি, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর, তাদেরকে আল্লাহ লা‘নত করেন এবং লা‘নতকারীগণও তাদেরকে লা‘নত করে। তারা ছাড়া, যারা তাওবা করেছে, শুধরে নিয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। অতএব, আমি তাদের তাওবা কবূল করব। আর আমি তাওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৯-১৬০] এ আয়াত শিহরিত করে তোলে, অন্তর প্রকম্পিত হয়ে উঠে, উপদেশ প্রদানকারী নিজে যেহেতু জানে যে তারও শেষ পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু, পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ, সুতরাং সেও ভীত সন্ত্রস্ত যে এ ধমকি না আবার তাকেও পেয়ে বসে। বস্তুত আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী।

দ্বাদশ অসিয়্যত: বিদ‘আত ও নতুনত্ব থেকে হুশিয়ারী

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী রহ. ‘ইরবাদ ইবন সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

“একদিন ফজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে এমন এক নসীহত করলেন যে, তাতে আমাদের চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এতো বিদায়ী ব্যক্তির মতো নসীহত, আপনি আমাদের জন্য কিছু অসিয়্যত করুন। তিনি বললেন, তোমাদের আমি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করতে অসিয়্যত করছি; যদি হাবশী গোলামও আমীর নিযুক্ত করা হয় তবুও তার প্রতি অনুগত থাকবে, তার নির্দেশ শুনবে। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা বহু বিরোধ দেখবে। তোমাদের কর্তব্য হলো আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের উপর অবিচল থাকা। এগুলো তোমরা চোয়ালের দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখবে। তোমরা সাবধান থাকবে নতুন নতুন বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে। কারণ, সমস্ত বিদ‘আত হলো গুমরাহী”।[1]

---

[1] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৭১৪৪; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৭; তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৭৬। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ভূমিকা:

সরল-সঠিক ইসলামী শরী'আতের আইন-কানুনসমূহকে ভিনদেশী আজব নিয়ম-কানুনের অনুপ্রবেশ থেকে সংরক্ষণ করা এ উম্মতের প্রত্যেকটি ব্যক্তির ওপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব; বিশেষ করে এ উম্মতের আলেম, মুজতাহিদ এবং দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারীদের ওপর ন্যস্ত। এটি সঠিক আক্বীদাকে সংরক্ষণ করার জন্যই করতে হবে, যা দীন ইসলামের মূলভিত্তি।

ইসলামী শরী'আহ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ শরী'আত এভাবেই অবশিষ্ট থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরল-সঠিক দীন ইসলামের সমস্ত মৌলিক নীতিমালা পরিপূর্ণ করেই মারা যান। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾ [المائدة: ٣]

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি'আমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩]

দীন পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পরে এতে কোনো কিছু বাড়ানো বা কমানো বা পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ এসব কাজ করতে চাইলে সে হবে বিদ'আতী, মিথ্যাবাদী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে অগ্রবর্তী হওয়ার দুঃসাহসকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًاۚ﴾ [هود: ١٨]

"যারা আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটনা করে, তাদের চেয়ে অধিক যালিম কে?"। [সূরা হূদ, আয়াত: ১৮]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ﴾ [الحجرات: ١]

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না”। [সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১]

দীনের মধ্যে নতুনত্ব আনা আসলে ইসলামের মূলভিত্তিকে ধ্বংস করার নামান্তর। উম্মতের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে ও মতানৈক্য সৃষ্টি করতে এ বিদ‘আত মারাত্মক ক্ষতিকর। আর এ কারণে উম্মতের মধ্যে শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি-হানাহানি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে আছে। এ জন্যই আল্লাহর হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের মধ্যে বিদ‘আত ও নতুন আবিষ্কার থেকে বিরত থাকতে বিশেষভাবে অসিয়্যত করেছেন। বিদ‘আত হলো কবীরা গুনাহ এবং তা পথভ্রষ্টতা। যেমন, আল্লাহর হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন,

«وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» .

“এবং সমস্ত ভ্রষ্টতা জাহান্নামে যাবে”।[1]

বিদ‘আতের পরিচিতি:

কোনো মুসলিমই বলতে পারবে না যে, শরী‘আতে বিদ‘আত গ্রহণযোগ্য বা শরী‘আত প্রণেতার কাছে ভালো কাজ বলে গণ্য। এ সত্বেও বিদ‘আত মুসলিমের মাঝে ছড়িয়ে আছে। এর কারণ হলো মানুষ অন্যের বিদ‘আতকে নিষেধ করে; কিন্তু নিজেদের মধ্যে যেসব বিদ‘আত ছড়িয়ে আছে তা স্বীকার তো করেই না; বরং বলে এসব তার পূর্বপুরুষ ও জাতির থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব, এগুলোকে সে বিদ‘আতই মনে করে না। মূলত বিদ‘আতের অর্থ অনেকের কাছেই অস্পষ্ট থাকায় এ ভুল হয়ে থাকে। ইমাম শাতেবী রহ. এর বিদ‘আতের সংজ্ঞাটি সর্বোত্তম সংজ্ঞা। তিনি বলেছেন, ‘বিদ‘আত হলো দীনের

[1] সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১৫৭৮; সহীহ ইবন খুযাইমাহ, হাদীস নং ১৭৮৫।

মধ্যে আবিষ্কৃত এমন পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে চলে শরী‘আতের ওপর চলা উদ্দেশ্য করা হয়। অর্থাৎ এ পথে চলে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়। বিদ‘আতের আরো স্পষ্ট নীতিমালা হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে মানুষ এমন সব কাজ করে যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সম্মানিত সাহাবীগণ করেন নি অথচ এ ধরণের কাজ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের সময় হওয়া সম্ভবপর ছিলো; কিন্তু নিষেধাজ্ঞা থাকায় সে সময় তারা করেন নি।

বিদ‘আত ছড়ানোর কারণসমূহ:

প্রথমত: আল্লাহর নৈকট্য লাভে ইবাদতে অতিরিক্ত করার ভুল ধারণা:

১- জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» ، فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন, হঠাৎ তিনি লোকের জটলা এবং ছায়ার নিচে এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এর কী হয়েছে? লোকেরা বলল, সে সায়িম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “সফরে সাওম পালনে (আলাদা) কোন সাওয়াব নেই”।[1]

২- ইমাম মালিক তার মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এর কী হয়েছে? তারা বললেন, সে মানত করেছে যে, কারো সাথে কথা বলবে না, রোদ থেকে ছায়া নিবে না, বসবে না এবং সাওম পালন করবে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ».

---

[1] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১১৫।

“তোমরা লোকটিকে বলে দাও সে যেন কথা বলে, ছায়াতে যায়, বসে এবং তার সাওম পূর্ণ করে”।[1]

৩- ইমাম বুখারী কাইস ইবন আবু হাযিম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ، فَرَآهَا لاَ تَكَلَّمُ، فَقَالَ: «مَا لَهَا لاَ تَكَلَّمُ؟» قَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً، قَالَ لَهَا: «تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ» ، فَتَكَلَّمَتْ».

“একদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এক মহিলার নিকট গমন করলেন। তিনি দেখলেন, মহিলাটি কথাবার্তা বলছে না। তিনি (লোকজনকে) জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাটির এ অবস্থা কেন, কথাবার্তা বলছে না কেন? তারা তাঁকে জানালেন, এ মহিলা নীরব থেকে থেকে হজ পালন করে আসছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাকে বললেন, কথা বলো কেননা তোমার চুপ থেকে হজ পালন কাজটি হালাল নয়। এটি জাহেলি যুগের কাজ। তখন মহিলাটি কথাবার্তা বলল”।[2]

৪- যুবাইর ইবন বাক্কার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মালেক ইবন আনাস রহ. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একলোক তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো,

«يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، فقال: فأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن تري أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني سمعت الله يقول: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣﴾ [النور : ٦٣]

---

[1] মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ১৭২৩; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭০৪।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৮৩৪।

“হে আবু আব্দুল্লাহ! আমি কোথা থেকে ইহরাম বাঁধবো? তিনি বললেন, যুল হুলাইফা থেকে; যেখান থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বেঁধেছেন। সে বললো, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মসজিদে নববী থেকে ইহরাম বাঁধতে চাই। তিনি (মালিক ইবন আনাস রহ.) বললেন, তুমি এরূপ করো না; কেননা আমি তোমার ব্যাপারে ফিতনার আশংকা করছি। সে বলল, এতে আবার কিসের ফিতনা? এতো কয়েক মাইল অতিরিক্ত পথ মাত্র! তিনি বললেন, তুমি এর চেয়ে আর বড় কী ফিতনার আশংকা করো যে, তুমি মনে করো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী হবে? তুমি কি মনে কর যে রাসূল এ সাওয়াব অর্জনে কসুর করেছেন? অথচ আল্লাহ বলেছেন,

﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣﴾ [النور: ٦٣]

“অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬৩] [1]

৫- ইমাম বুখারী রহ. ‘আওন ইবন আবু জুহাইফার সূত্রে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

«آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ؟ قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: سَلْمَانُ قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا،

[1] মির‘আতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, ৮/৩৬৪।

وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ سَلْمَانُ».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ও আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দেন। (একবার) সালমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে উম্মে দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে মলিন কাপড় পরিহিত দেখতে পান। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উম্মে দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বললেন, আপনার ভাই আবু দারদার পার্থিব কোনো কিছুর প্রতি মোহ নেই। কিছুক্ষণ পরে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এলেন। তারপর তিনি সালমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর জন্য খাবার প্রস্তুত করান এবং বলেন, আপনি খেয়ে নিন, আমি সাওম পালন করছি। সালমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আপনি না খেলে আমি খাব না। এরপর আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সালমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সঙ্গে খেলেন। রাত হলে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সালাত আদায়ে দাঁড়াতে গেলে সালমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, এখন ঘুমিয়ে যান। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আবার সালাতে দাঁড়াতে উদ্যত হলে সালমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ঘুমিয়ে যান। যখন রাতের শেষভাগ হলো তখন সালমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বললেন, এখন সালাতে দাঁড়ান। এরপর তারা দু’জনে সালাত আদায় করলেন। পরে সালমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাকে বললেন, আপনার ওপর আপনার রবের হক আছে, আপনার নিজেরও হক আছে, আপনার ওপর রয়েছে আবার আপনার পরিবারেরও হক রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করুন। এরপর আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। (সব

শুনে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “সালমান ঠিকই বলেছে”।[1]

দ্বিতীয়ত: প্রবৃত্তির অনুসরণ

নিজেকে মানুষের মাঝে প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষা মানব জীবনে বড় প্রভাব ফেলে থাকে। আর এ আকাঙ্ক্ষা যখন শরী‘আতের বাধা-নিষেধ মুক্ত হয়ে দিন দিন বেড়ে উঠতে থাকে, এমনকি ধীরে ধীরে মানুষের অনুভূতিতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় এবং তার সাধারণ চলাফেরাতেও অনুপ্রবেশ করে, তখন সে ব্যক্তি আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে বিদ‘আত ও নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতে থাকে এবং তা চর্চা করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيۡرِ هُدٗى مِّنَ ٱللَّهِۚ﴾ [القصص: ٥٠]

“আর আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে?”। [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫০]

﴿وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ٢٦﴾ [ص: ٢٦]

“আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল”। [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৬]

তৃতীয়ত: মা‘সূম (পাপমুক্ত) নন এমন ব্যক্তির নির্দেশনার প্রতি আত্মসমর্পন:

বিদ‘আত সৃষ্টির আরেকটি কারণ হলো, মা‘সূম তথা পাপমুক্ত নন এমন ব্যক্তির প্রতি আত্মসমর্পন করা ও তার কথা বা কাজকে শরী‘আতের দলীল মনে করা। কেননা যে ব্যক্তি দ্বারা পাপ-পুণ্য দুটোই হতে পারে সে ব্যক্তি ভুল-শুদ্ধ দুটোই

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৬৮।

করতে পারে। সে ব্যক্তি যদি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন না করে তাহলে সে মিথ্যা বলতে পারে। ফলে এ ধরণের ব্যক্তির কথার প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন ও তার অন্ধ অনুসরণ পথভ্রষ্টতা, বিদ‘আত এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের ওপর মিথ্যাচারের কারণ।

আমাদের সম্মানিত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যীন (সর্বশেষ নবী), তার আনিত কিতাব সর্বশেষ আসমানী কিতাব এবং তার শরী‘আত সর্বশেষ শরী‘আত। অতএব, তিনি যে বিধান দিয়েছেন এর ওপর কোনো বিধান নেই এবং তার সুন্নাতের (পথের) ওপর আর কোনো সুন্নত (পথ) নেই। এ সীমারেখা থেকে বের হওয়া মানে বিদ‘আতের পথ সুগম করা।

চতুর্থত: সহীহ হাদীস ছেড়ে দ‘য়ীফ বা দুর্বল হাদীসের ওপর নির্ভর করা:

আলেমগণ বলেছেন, বিদ‘আতের মূল কারণ হলো দ‘য়ীফ বা দুর্বল হাদীস; বরং এর চেয়েও মারাত্মক হলো মাউদু‘ বা বানোয়াট হাদীস। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .

“যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামকে তার আবাস বানিয়ে নিক”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ».

“কেউ যদি আমার নিকট থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে তা মিথ্যা, তবে সে হলো দুই মিথ্যাবাদীর একজন”।[2]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৯১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩।

[2] সহীহ মুসলিম, তিনি হাদীসটিকে তার মুকাদ্দামায় উল্লেখ করেছেন। তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৬২।

এ ব্যাপারে যে যতটুকু শিথিলতা করবে সে ব্যক্তি সুন্নত থেকে ততটুকু দূরে সরে যাবে এবং বিদ‘আতের ভয়ঙ্কর থাবায় পতিত হবে।

বিদ‘আতে হাসানা ও সাইয়্যেয়াহ নামে বিদ‘আতের শ্রেণিবিভাগ:

কোনো কোনো আলেম বিদ‘আতকে হাসানা ও সাইয়্যেয়াহ এ দু’ প্রকারে ভাগ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বিদ‘আতকে হাসানা ও সাইয়্যেয়াহ এ দু’ প্রকারে ভাগ করার কোনো দলীল নেই। কেননা সব বিদ‘আতই সাইয়্যেয়াহ তথা খারাপ। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ».

“সমস্ত বিদ‘আত হলো ভ্রষ্টতা এবং সমস্ত ভ্রষ্টতা জাহান্নামে যাবে”।[1]

এ হাদীসটি ইমাম নাসায়ী জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিমে জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে এতে নিম্নোক্ত বাক্যটি নেই,

« وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ».

“এবং সমস্ত ভ্রষ্টতা জাহান্নামে যাবে”।[2] তিনি এ শব্দ ব্যতীত বর্ণনা করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাখ্যা হবে এরূপ:

«مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً».

“যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম প্রথা প্রবর্তন করবে ...(সে তার সওয়াব তো পাবে)”।[3] যে ব্যক্তি ইসলাম অনুমোদিত কোনো ভালো কাজ করবে এবং তার দেখাদেখি অন্য মানুষেরাও তাকে অনুসরণ করল তবে সে তার সওয়াব তো পাবেই, উপরন্তু সে অনুসারে আমলকারীদের সমপরিমাণ সওয়াবও পাবে।

---

[1] সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১৫৭৮; সহীহ ইবন খুযাইমাহ, হাদীস নং ১৭৮৫।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৬৭।

[3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০১৭।

কেননা যখন এক সাহাবী দুর্ভিক্ষের সময় সদকা নিয়ে আসলেন এবং তার দেখাদেখি অন্যান্য সাহাবীগণও সদকা পেশ করলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি বলেছিলেন।

অন্যদিকে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বাণী,

«نِعْمَت البِدْعَةُ هَذِهِ».

“কতোই না উত্তম বিদ‘আত এটি”।[1] এখানে শাব্দিক অর্থে বিদ‘আত উদ্দেশ্য, বিদ‘আতের পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা মানুষ একজন ইমামের পিছনে একত্রিত হয়ে তারাবীর সালাত আদায় করা দেখে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এ কথা বলেছিলেন। আর সালাতুত তারাবীহ জামা‘আতের সাথে আদায় করা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুমোদিত ও বিধিবদ্ধ। যেহেতু তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে নিয়ে কয়েক রাত সালাতুত তারাবীহ আদায় করেছেন। পরে এ সালাত ফরয হওয়ার আশঙ্কায় তিনি জামা‘আতে আদায় করা ছেড়ে দিয়েছেন। লোকজন একাকী ও ভিন্ন ভিন্ন জামা‘আতে এ সালাত আদায় করছিলেন। অতএব, একজন ইমামের পিছনে জামা‘আতের সাথে এ সালাত আদায় করার পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিলো; যেহেতু তিনি কয়েক রাত এভাবে পড়েছেন, অতঃপর উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এসে এ সুন্নতটি পুনর্জীবিত করেছেন। তিনি শুধু কারণবশত বন্ধ হওয়া কাজটি পুনরায় চালু করেছেন। আর বন্ধ হওয়ার কারণ ছিলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সালাত মানুষের ওপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন। ফলে শাব্দিক অর্থে এ কাজটিকে বিদ‘আত বলা হয়েছে, শর‘ঈ অর্থে নয়। কেননা শর‘ঈ অর্থে বিদ‘আত হারাম। সুতরাং আল্লাহর সীমারেখায় সর্বদা দণ্ডায়মান এবং বিদ‘আত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০১০।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্ক বাণী অবগত উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর মতো একজন মানুষের পক্ষে এ ধরণের বিদ'আত সংঘটিত হতে পারে না। শরী'আত সম্মত জায়েয কাজের মাধ্যম হিসেবে বিদ'আত শর'ঈ অর্থে গ্রহণযোগ্য নয় যেমন, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও কিতাব ছাপানো; কেননা কোনো কিছুর মাধ্যম উক্ত জিনিসের উদ্দেশ্য হাসিলের হুকুম উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমসমূহ স্থান, কাল ও পাত্রভেদে পরিবর্তনশীল আর শর'ঈ উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম আবিষ্কার করা নিম্নোক্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত

«مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْر مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

"যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম প্রথা প্রবর্তন করবে সে তার সওয়াব তো পাবেই, উপরন্তু কিয়ামত পর্যন্ত এ আমলটি যারাই করবে তাদের সাওয়াবও লাভ করবে (কিন্তু আমলকারীর সাওয়াব কমানো হবে না)"।[1]

বিদ'আতকে হাসানা ও সাইয়্যেয়াহ হিসেবে যেমন ভাগ করা সমীচীন নয়, তেমনি যারা বিদ'আতকে পাঁচ প্রকারে ভাগ করেন তাও সঠিক নয়। এ পাঁচ প্রকার হলো, ওয়াজিব বিদ'আত, মুস্তাহাব বিদ'আত, হারাম বিদ'আত, মাকরূহ বিদ'আত ও জায়েয বিদ'আত। তবে এ প্রকারভেদ দ্বারা যদি বিদ'আতের শর'ঈ অর্থ উদ্দেশ্য না করে শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য করে তাহলে অসুবিধে নেই। বিদ'আতের শাব্দিক ও শর'ঈ অর্থ পার্থক্য নিরূপণে নিম্নোক্ত পদ্ধতিটি হয়ত আপনাকে সাহায্য করবে। আপনি যে নতুন কাজটি দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চান সেটি সম্পর্কে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, উক্ত কাজটি কী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবী থেকে প্রমাণিত? অর্থাৎ তারা কি কাজটি করেছেন? অতঃপর, তাদের সময় এ কাজের হেতু বা আবশ্যকীয়তা ছিল কী না? এ কাজ করার নিষেধাজ্ঞা অনুপস্থিত ছিলো কী না? যখন দেখবেন কাজটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর কোনো সাহাবী করেন

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০১৭; মু'জাম আল-আওসাত, হাদীস নং ৮৯৪৬।

নি; অথচ কাজটির হেতু সে সময় বিদ্যমান ছিলো এবং এ কাজ করতে কোনো নিষেধাজ্ঞাও ছিলো না, তা স্বত্বেও কাজটি করা হলো শর‘ঈ বিদ‘আত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ যদি আযানের বাক্যে আল্লাহু আকবর (الله أكبر) এর পরিবর্তে আল্লাহু ‘আলা(الله أعلى) বলে এবং এর দ্বারা সে আল্লাহর অধিক মহত্ত্ব ও সম্মান উদ্দেশ্য করে তখন আমরা বলবো, এ ধরণের কাজ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নি অথচ এ কাজের হেতু তখনও বিদ্যমান ছিলো, আর তা হলো আল্লাহর মহত্ত্ব ও সম্মান বর্ণনা করা এবং এ কাজ করতে নিষেধাজ্ঞাও বিদ্যমান ছিলো না। তখন আমরা বুঝব এ কাজটি বিদ‘আত এবং ভ্রষ্টতা।

আরেকটি উদাহরণ উল্লেখ করছি, তা হলো: যদি একদল লোক সালাতুদ দোহা জামা‘আতে আদায় করতে অভ্যস্ত হয় এবং যুক্তি হিসেবে তারা যদি বলে, আমরা একে অন্যেকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিতে এ কাজটি করছি, তখন একইভাবে আমরা বলবো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে নিয়ে সালাতে অভ্যস্ত করতে জামা‘আতের সাথে সালাতুদ দোহা আদায় করেন নি; অথচ এ কাজের হেতু তথা মানুষকে সালাতুদ দোহার প্রতি উৎসাহ দেওয়ার হেতু তখনও বিদ্যমান ছিলো এবং নিষেধাজ্ঞাও ছিলো না। এভাবে আমরা জানতে পারলাম, সালাতুদ দোহা এভাবে জামা‘আতে আদায় করা বিদ‘আত। এ ধরণের বিদ‘আতকে বিদ‘আতে ইদাফিয়্যা তথা অতিরিক্ত বিদ‘আত বলে। এটি মূলত আসল বিদ‘আত ও অতিরিক্ত বিদ‘আতের মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর জন্য এভাবে ভাগ করা হয়েছে। আসল বিদ‘আত হলো বান্দাহর সেসব আমলসমূহ যা শরী‘আত অননুমোদিত।

ত্রয়োদশ অসিয়্যত: গোলযোগ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে সতর্কীকরণ

ইমাম বুখারী ও মুসলিম জারীর ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিদায় হজের দিনে বলেছেন,

«اسْتَنْصِتِ النَّاسَ» فَقَالَ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

“তুমি লোকদেরকে চুপ করিয়ে দাও”, তারপর তিনি বললেন, “আমার পরে তোমরা কাফির (এর মতো) হয়ে যেও না যে, একে অপরের গর্দান কাটবে”।[1]

ভূমিকা:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ যামানায় যে সব ফিতনা-ফাসাদ, পাপাচার ও যুলুম-অত্যাচার সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে ভবিষৎ বাণী করেছেন তিনি নৈরাজ্য, রক্তপাত ও হত্যা সম্পর্কেও আমাদেরকে অগ্রীম সংবাদ দিয়েছেন তিনি বলেছেন,

«لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ العِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ - وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ».

“কিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভুমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে (হারজ অর্থ খুন-খারাবী)”।[2]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ» قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ الْقَتْلُ».

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৭।

“কিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না হারজ বৃদ্ধি পাবে সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হারজ কী? তিনি বললেন, হারজ হলো খুনখারাবী”।[1]

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ، وَلَا يَدْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ، فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الْهَرْجُ».

“ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে, যখন হত্যাকারী জানবে না যে, কী অপরাধে সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, কী অপরাধে সে নিহত হয়েছে প্রশ্ন করা হল, এমন যুলুম কিভাবে হবে? তিনি উত্তরে বললেন, সে যুগটা হবে হত্যার যুগ”।[2]

মানুষ হত্যা করা কুফুরীর পরের কবীরা গুনাহ। সুতরাং “মাসলাহা রাজেহা” প্রাধান্যপ্রাপ্ত স্বার্থ ব্যতীত কারও হত্যা বৈধ নয়। অর্থাৎ কাউকে হত্যা করার মাধ্যমে যদি তার হত্যা করার চেয়েও বড় কোনো অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ হয়, কেবল সে অবস্থায় তাকে হত্যা করা যাবে; অন্যথায় কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢]

“এ কারণেই, আমরা বনী ইসরাঈলের ওপর এ হুকুম দিলাম যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩২]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৭।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯০৮ ও ২৯০৯।

এ আয়াতে কারীমা থেকে আলেমগণ নিম্নোক্ত মূলনীতি গ্রহণ করেছেন: ‘কোনো আত্মাকে ধ্বংস না করাই হলো মূল’।

ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, শরী‘আতের মূল হলো, আল্লাহ তা‘আলা হক বা যথাযথ নীতি ব্যতীত কাউকে হত্যা করা হারাম করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا﴾ [المائدة: ٣٢]

“এ কারণেই, আমরা বনী ইসরাঈলের ওপর এ হুকুম দিলাম যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩২]

সুতরাং হত্যার বিনিময়ে হত্যা অথবা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করার কারণে হত্যা ছাড়া কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়। জমিনে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করা, যেমন কোনো মুসলিম তার দীন ছেড়ে দেওয়া এবং ডাকাতি করা ইত্যাদি।[1]

ইবন দাকীক আল-‘ঈদ রহ. যুদ্ধ থেকে বিরত কাফিরকে হত্যা না করার কারণ সম্পর্কে বলেন, সম্ভবত শরী‘আতের মূল হলো কোনো আত্মাকে নষ্ট না করা। আর জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হত্যা করা জায়েয করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে না এবং সাধারণত যুদ্ধের জন্য উপযোগীও না, তারা যুদ্ধকারীদের মতো জমিনে ক্ষয়-ক্ষতি সৃষ্টি করে না, ফলে তাদের মূল বিধান হলো তাদেরকে হত্যা না করা।[2]

কুরআনের অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, মানুষের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্টের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও সর্বাধিক অপছন্দনীয় অন্যায় হলো রক্তপাত, জমিনে

---

[1] কায়েদাতুন মুখতাসারা ফি কিতালিল কুফফার ওয়ামুহাদানাতিহিম, ইবন তাইমিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২০৩-২০৪

[2] ইহকামুল আহকাম থেকে সংগৃহীত

ফাসাদ সৃষ্টি ও অহংকার করে নিজের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করা আল্লাহ তা‘আলা এ সম্পর্কে কুরআনের একশত বিশ বারেরও অধিক বলেছেন।

কুরআনের অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, শরী‘আত মূলত তিনটি অন্যায়ের প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা হিসেবেই কিসাস, হুদুদ ও জিহাদে হত্যা অনুমোদন করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَـٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩﴾ [البقرة: ١٧٩]

“আর হে বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৯]

আরও বলেছেন,

﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ﴾ [المائدة: ٣٣]

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমিনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হলো, তাদেরকে হত্যা করা হবে”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩৩]

আরও বলেছেন,

﴿وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ﴾ [البقرة: ٢٥١]

“আর আল্লাহ যদি মানুষের কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই জমিন ফাসাদপূর্ণ হয়ে যেত”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫১]

অন্যদিকে মুসলিমকে হত্যা করার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সতর্ক করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ٩٣﴾ [النساء : ٩٣]

“আর যে ইচ্ছাকৃত কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে আর আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে

লা'নত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৯৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا التقى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ» ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ».

"দু'জন মুসলিম তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ হত্যাকারী (তো অপরাধী), কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী অপরাধ? তিনি বললেন, (নিশ্চয়) সে তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব ছিল"।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ».

"তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে বিরত থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরী'আতের হক ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা, রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং সচ্চরিত্রের অধিকারিনী মুমিন নারীদের ওপর অপবাদ দেওয়া"।[2]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا».

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৬৬।

“মুমিন ব্যক্তি তার দীনের ব্যাপারে পূর্ণ প্রশান্তমনা থাকে, যে পর্যন্ত সে কোনো হারাম (অবৈধ) রক্তপাতে লিপ্ত না হয়”।[1]

এ কারণেই ইমামের বিরুদ্ধে বের হওয়ার বিদ‘আত ইসলামে সর্বাধিক বিপর্যয় ছিলো। ইসলামের ইতিহাসে যুগে যুগে বিবিধ জঘন্য বিদ‘আত সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু তন্মধ্য থেকে একটি বিদ‘আত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য সহীহ হাদীসে কঠোরভাবে হুশিয়ারী ও সতর্ক করেছেন। তা হলো, মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে খারেজীদের বের হওয়ার বিদ‘আত। তারা অন্যান্য মুসলিমকে কাফির মনে করে এবং তাদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করে।

হাদীস শরীফে এসেছে,

«وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ».

“আর আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ওপর আক্রমণ করে, তাদের ভালো ও মন্দ সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করে, এমনকি তাদের মুমিনকেও রেহাই দেয় না এবং তাদের প্রতি প্রদত্ত (নিরাপত্তার) চুক্তিও পূরণ করে না, আমার সাথে সে ব্যক্তির কোনো সম্পর্ক নেই এবং আমি সে ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত (দলে) নই”।[2]

অপ্রিয় বাস্তবতা:

বর্তমান বিশ্বে কিছু মুসলিম রক্তপাতকে গুরুত্বহীন মনে করে। তাদের অবস্থা অবলোকন করলে অন্তরাত্মা অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে সোমালিয়া, সুদান, ইরাক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ কাফিরদের

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৮৬২।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৪৮।

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিবর্তে তারা নিজেরা নিজেদের ভাইদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে আছে।

মুসলিম বিশ্বের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় যেন তারাই হাদীসে বর্ণিত সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ - وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ».

"কিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে হারজ অর্থ খুন-খারাবী"। [1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ، وَلَا يَدْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ، فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الْهَرْجُ ».

"ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে, যখন হত্যাকারী জানবে না যে, কী অপরাধে সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, কী অপরাধে সে নিহত হয়েছে। প্রশ্ন করা হলো, এমন যুলুম কীভাবে হবে? তিনি উত্তরে বললেন, সে যুগটা হবে হত্যার যুগ"।[2]

অতএব, আলেম ও দা'ঈদের উচিত এ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা, তাদেরকে সঠিক পথনির্দেশনা দেওয়া এবং তাদের দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় উম্মতকে যেভাবে গুরুত্বের সাথে ফিতনা-ফাসাদ থেকে সতর্ক করেছেন সেভাবে তাদেরকেও সাবধান করা।

ইসলামী শরী'আত জীবন সংরক্ষণে যথার্থ ভূমিকা রাখে:

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি ইসলামকে তাদের

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৭।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯০৮ ও ২৯০৯।

দীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। এ দীন তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা দিয়েছে। আল্লাহ মক্কায় মুশরিকদের ওপর তাঁর নিরাপত্তার নি'আমতকে স্মরণ করে দিয়ে বলেছেন,

﴿أَوَ لَمۡ نُمَكِّن لَّهُمۡ حَرَمًا ءَامِنًا يُجۡبَىٰٓ إِلَيۡهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَيۡءٍ﴾ [القصص: ٥٧]

"আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ 'হারাম' এর সুব্যবস্থা করি নি? সেখানে সব ধরনের ফলমূল আমদানী করা হয়"। [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫৭]

এভাবে দীন ইসলাম নিরাপত্তার পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক ও আবাসস্থল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا جَعَلۡنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنۡ حَوۡلِهِمۡ﴾ [العنكبوت: ٦٧]

"তারা কি দেখে না যে, আমরা 'হারাম' কে নিরাপদ বানিয়েছি অথচ তাদের আশপাশ থেকে মানুষদেরকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়?"। [সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত: ৬৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ ٣ ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ ٤﴾ [قريش: ٣، ٤]

"অতএব, তারা যেন এ গৃহের রবের ইবাদাত করে, যিনি ক্ষুধায় তাদেরকে আহার দিয়েছেন আর ভয় থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন"। [সূরা আল-কুরাইশ, আয়াত: ৩-৪]

মানুষ যেসব বালা-মুসিবত ও ভয়-ভীতিতে পতিত হচ্ছে তা মূলত তাদেরই হাতের কামাই। এ কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন,

﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا قَرۡيَةٗ كَانَتۡ ءَامِنَةٗ مُّطۡمَئِنَّةٗ يَأۡتِيهَا رِزۡقُهَا رَغَدٗا مِّن كُلِّ مَكَانٖ فَكَفَرَتۡ بِأَنۡعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلۡجُوعِ وَٱلۡخَوۡفِ بِمَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ ١١٢﴾ [النحل: ١١٢]

"আর আল্লাহ উপমা পেশ করছেন, একটি জনপদ, যা ছিল নিরাপদ ও শান্ত। সবদিক থেকে তার রিযিক বিপুলভাবে আসত অতঃপর সে (জনপদ) আল্লাহর

নি‘আমত অস্বীকার করল তখন তারা যা করত তার কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষুধা ও ভয়ের পোশাক পরালেন”। [সূরা: আন-নাহল, আয়াত: ১১২]

অতএব, নিরাপত্তার দ্বারাই জনস্বার্থ অর্জিত হয় নিরাপত্তা স্থির হলে, বিশৃঙ্খলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এবং যারা মানুষকে ভয়-ভীতি দেখায় তাদেরকে নিঃশেষ করে দিলে মানুষের সর্বাধিক উপকার সাধিত হবে।

শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকা:

একথা সর্বজন বিদিত যে, আমাদের শত্রুরা মুসলিম দেশে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকা কখনোই চায় না। তারা কখনোই চায় না যে, সেখানে জীবনের নিরাপত্তা থাকুক, ইসলামী শরী‘আহ বাস্তবায়ন হোক, আল্লাহর দিকে দাওয়াত চালু থাকুক এবং সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় থাকুক। তারা আশা করে মুসলিম দেশে যেন সর্বদা ফিতনা-ফাসাদ, রাহাজানি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকে। এজন্য তারা মুসলিমদেরকে নানা দলে বিভক্ত করতে, তাদের মধ্যে মতানৈক্য ও ঝগড়া-ঝাটি সৃষ্টি করতে একদল সরল মুসলিম ও স্বার্থান্বেষী মানুষকে কাজে লাগিয়ে সুযোগের সন্ধানে থাকে এবং সময় মতো এ সুযোগকে সদ্ব্যবহার করে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, মুসলিমের মধ্যকার দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যা তাদের মধ্যে বিভক্তি, মতানৈক্য, শয়তানের প্ররোচনা, মুসলিম ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের ফলেই সংঘটিত হয়েছে।

আল্লাহই সাহায্যকারী, তিনিই আমাদের যথেষ্ট ও তিনি উত্তম অভিভাবক।

চতুর্দশ অসিয়্যত: সুদ থেকে হুশিয়ারী

১- ইমাম মুসলিম জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সূত্রে বিদায় হজের দীর্ঘ ভাষণ থেকে বর্ণনা করেন, এতে তিনি আরাফার দিনে নামিরায় প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজের ভাষণ উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ».

“আর জাহেলী যুগের সুদ প্রথা বাতিল ঘোষিত হলো। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আমি আমাদের প্রাপ্য সুদ, যা আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ বাতিল ঘোষণা করলাম”। [1]

২- আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ ‘আমর ইবন আহওয়াস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজের ভাষণ উল্লেখ করেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ».

“জেনে রেখো, জাহেলী যুগের সব সুদ বাতিল করা হলো। তোমাদের মালের মূলধন তোমাদের থাকবে। তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারীতও হবে না”। [2]

৩- ইমাম দারেমী ও আবু ইয়া‘লা আল-মুসিলী আবু হুররাহ আর-রকাশীর সূত্রে, তিনি তার চাচার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আইয়্যামুত তাশরীকের মধ্য দিনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটের লাগাম

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৩৩৪; তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৮৭। তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৫৫।

ধরে ছিলাম। লোকজনকে তাঁর চারপাশ থেকে সরিয়ে দিচ্ছিলাম। তখন তিনি তাঁর খুৎবায় বললেন,

«أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى أَنَّ أَوَّلَ رِبًا يُوضَعُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ، وَلَا تُظْلَمُونَ».

“জেনে রেখো, জাহেলী যুগের সব সুদ বাতিল করা হলো। আল্লাহ সর্বপ্রথম আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ বাতিল করার ফয়সালা করেছেন। তোমাদের মালের মূলধন তোমাদের থাকবে। তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না”।[1]

যদিও এ হাদীসের সনদের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে; তথাপি যদি এ সনদটি সহীহ হয় তাহলে এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলি যুগের সব সুদ রহিত ও হারাম করার ঘোষণা করেছেন। তিনি তাঁর পরিবার থেকেই সর্বপ্রথম শুরু করেছেন। এ ঘোষণা তিনি বিদায় হজের ভাষণে দু’বার উল্লেখ করেছেন। একবার আরাফার দিনে এবং আরেকবার আইয়্যামে তাশরীকের মাঝের দিনে।

ভূমিকা:

প্রাচীন ও আধুনিককালে সুদের বহুল পরিচিত রূপটি এমন যে, ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ নিয়ে সে উক্ত সময়ের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করবে। লেনদেনের ক্ষেত্রে এ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করাকে আরবীয় সুদী ব্যাংকিয়ে ‘খিদমাতুদ দাইন’ (ঋণের বিনিময়ে সেবা) বা ‘ফায়েদা’ (লাভ) বলা হয়। আবার সুদী ঋণকে ‘করদু বিফাইদাহ’ (লাভের বিনিময়ে ঋণ)ও বলা হয়। এ শব্দগুলো আরবী ভাষায় সুদী লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষায় সুদকে (Interest) বা লাভ বলে।

রিবার (সুদের) হুকুম:

---

[1] সুনান দারেমী, হাদীস নং ২৫৭৬; মুসনাদ আবু ইয়া‘লা আল-মুসিলী, হাদীস নং ১৫৬৯।

সমস্ত আসমানী শরী‘আতে সুদ হারাম। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَبِظُلۡمٖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ لَهُمۡ وَبِصَدِّهِمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرٗا ١٦٠ وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ ١٦١﴾ [النساء : ١٦٠، ١٦١]

“সুতরাং ইয়াহূদীদের যুলমের কারণে আমি তাদের ওপর উত্তম খাবারগুলো হারাম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে অনেককে তাদের বাধা প্রদানের কারণে। আর তাদের সুদ গ্রহণের কারণে অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত, ১৬০-১৬১]

এছাড়া জাহেলী যুগের আইনেও সুদ হারাম ছিলো। যেমন, হামুরাবী ও মিসরী ফিরাউনদের আইনে সুদ হারাম হিলো। এমনকি আধুনিক ধর্মনিরেপক্ষ আইনেও সুদের কিছু প্রকার হারাম করা হয়েছে। যেমন ফ্রান্সের আইনের (১৯৩৫) নং ধারায় ও ইটালির ফৌজদারি আইনের (৬২২) নং ধারায় সুদকে হারাম করা হয়েছে।

আমাদের ইসলামী শরী‘আহ আইনে সুদকে হারাম করা হয়েছে। কুরআনে সুদখোরের ব্যাপারে এতো মারাত্মক ও ভয়াবহ শাস্তির বিধান উল্লেখ করা হয়েছে যা অন্য অপরাধের ক্ষেত্রে বলা হয় নি। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

“যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫] রবং আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩]

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৮-২৭৯] আর একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী অবশ্যই পরাজিত হবে।

সুদকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ».

“তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে বিরত থাকবে। সাহাবীগন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরী‘আতের হক ব্যতীরেকে তাকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা, রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং সতী-সাধ্বী মুমিন নারীদের অপবাদ দেওয়া”।[1]

যে ব্যক্তি সুদের লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত তাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা‘নত করেছেন। জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন,

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ» ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৬৬।

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা, সুদের হিসাব রক্ষক বা দলীল লেখক এবং সুদের সাক্ষীদ্বয়কে অভিসম্পাত করেছেন তিনি আরো বলেছেন, তারা সবাই সমান অপরাধী”।[1]

ব্যক্তি ও সমাজের ওপর সুদের ভয়াবহতা:

ব্যক্তির ও সমাজের ক্ষতির বিবেচনায় সুদ সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ» .

“যখন কোনো সমাজে যিনা ও সুদ প্রকাশ পাবে তখন তারা যেন আল্লাহর আযাবকে নিজেদের উপর বৈধ করে নিলো (অর্থাৎ তাদের ওপর আল্লাহর আযাব অনিবার্য)”।[2] এটি মূলত আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীরই প্রমাণ। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩]

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৮-২৭৯]

আর ব্যক্তির ওপর সুদের ক্ষতির সর্বনিম্ন পর্যায় হলো জীবিকা নির্বাহে বরকত থেকে সে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦]

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৯৮।

[2] মুসতাদরাক হাকিম, হাদীস নং ২২৬১। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

“আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৬] এছাড়া সুদী কারবারে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা‘নত করেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ» ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা, সুদের হিসাব রক্ষক বা দলীল লেখক এবং সুদের সাক্ষীদ্বয়কে অভিসম্পাত করেছেন তিনি আরো বলেছেন, তারা সবাই সমান অপরাধী”।[1]

সুদের ক্ষতিসমূহ:

সুদের মারাত্মক ক্ষতির কারণে প্রাজ্ঞ শরী‘আত প্রণেতা সুদকে এতো কঠোরভাবে হারাম ও এ ব্যাপারে চুড়ান্ত সতর্ক ও হুশিয়ারী করেছেন। সুদের বাহ্যিক ক্ষতিকর কারণসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১- মানুষের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় আর পরস্পরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ থেকে বারণ করা এবং এগুলোর সব উপায়-উপকরণ বন্ধ করা ইসলামী শরী‘আতের অন্যতম বিধান।

২- সুদের কারণে কর্যে হাসানা বা উত্তম ঋণের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কেননা সুদ প্রথা চালু থাকলে মানুষ কর্যে হাসানা দিতে বারণ করে। তখন অভাবী ব্যক্তি সুদ গ্রহণে বাধ্য হয়। আর আল-কুরআন সুদের ব্যাপারে সতর্ক করার পাশাপাশি সদাকা প্রদানে উৎসাহিত করেছে। সূরা বাকারাতে দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করে ১৪ টি আয়াতের পরে সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে হুশিয়ারী করে সাতটি আয়াত এসেছে।

[1] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৬২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৯৮।

আল্লাহ ﴿يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ "আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন" বলার সাথে সাথে ﴿وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِ﴾ "এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন" বলেছেন।

আবার সূরা আলে-ইমরানে তিনি

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ﴾ [ال عمران: ١٣٠]

"হে মুমিনগণ, তোমরা সুদ খাবে না বহুগুণ বৃদ্ধি করে"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩০] বলার পর সদাকা সম্পর্কে বলেছেন,

﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ﴾ [ال عمران: ١٣٤]

"যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে..."। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪] সূরা রূমে আল্লাহ তা'আলা সুদ সম্পর্কে বলার পরপরই যাকাত সম্পর্কে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩﴾ [الروم: ٣٩]

"আর তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলতঃ আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত"। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩৯]

৩- সুদের ঋণ পরিশোধে অক্ষম ও অস্বচ্ছল লোকদের সংকীর্ণতা বেড়ে যায়। সুদের কিস্তি পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে কত আদালতে দেন দরবার ও জেল হাজত খাটতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

৪- সুদখোরের মধ্যে পার্থিব চরিত্র বাড়তে থাকে। সুদে অভ্যস্ত ব্যক্তির মধ্যে নানা অসচ্চরিত্র যেমন, খাইখাই, আত্মম্ভরিতা, নিষ্ঠুরতা, শোষণ ও লোভ-লালসা দিন দিন বাড়তে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

“যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫]

৫- গরিবের ধন-সম্পদ একশ্রেণীর মানুষের কাছে গচ্ছিত হয়ে যায়।

এ কথা সকলের কাছেই স্পষ্ট যে, বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ধ্বস ও অবক্ষয় সুদের কুপ্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

সুদকে হালাল মনে করা ও সুদী কারবার করা:

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো বর্তমান যুগে অনেক মুসলিম সুদ ভিত্তিক লেনদেনকে হালাল মনে করে এবং তারা এ লেনদেন চর্চা করে। এর কারণ হলো, কিছু আলেমের লেনদেনের হাকিকত সম্পর্কে উদাসীনতা ও সুদ হারামের উদ্দেশ্যকে বিবেচনা না করা। ফলে তারা ব্যাংকে লাভের বিনিময়ে ঋণ আদান-প্রদানকে অনুমতি দিয়েছেন এ যুক্তিতে যে, যে ঋণের বিনিময়ে উপকার সাধিত হয় তাতে আলেমদের মতানৈক্য রয়েছে। তারা একথা ভুলে যায় যে, ব্যাংক যাকে কর্জ বা ঋণ বলে তা ফকিহগণের কর্জ ঋণ নয়। কেননা শর‘ঈ পরিভাষায় কর্জ বা ঋণ হলো, দু’ ব্যক্তির মধ্যে উপকারের চুক্তি, যাতে সময় কোনো উপকরণ হিসেবে ধর্তব্য নয়। অন্যদিকে লাভের বিনিময়ে ব্যাংক যে লোন বা কর্জ দেয় তা দু’ব্যক্তির মাঝে বিনিময়ের চুক্তি, এতে সময় একটি উপকরণ হিসেবে কাজ করে। আর একেই ফিকহের পরিভাষায় সুদী বেচা-কেনা বলে। এর চেয়ে আর কী প্রমাণ লাগবে যে, আরব ব্যাংকসমূহ যখন অনারবী ভাষায় লেনদেন করে তখন একে তারা রিবা বলে, এমনিভাবে অনারবী মুসলিমরাও এ ধরণের লেনদেনকে রিবা নামেই জানে।

তাছাড়া আধুনিক ব্যাংক সুদী কারবারকে কৌশল করে ‘তাওয়াররুক’ বলে চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মানুষের অসাবধানতা ও অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ফকিহগণের ‘তাওয়াররুক’ কে সুদী লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছেন। অথচ ‘তাওয়াররুক’ কে কেউ কেউ জায়েয বলেছেন, আবার কেউ একে হারাম

বলেছেন। সুদী কৌশলে যেভাবে লেনদেন করা হয় তার সাথে ‘তাওয়াররুক’ এর সাথে মিল নেই। তাদের এ কথাটি আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর মতোই,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

“এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতই”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫]

অসৎ কৌশল আর শর‘ঈ পরিত্রাণের উপায়ের মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য; যদিও উভয়ের মধ্যে কিছুটা মিল পাওয়া যায়। এতে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে; কিন্তু আল-হামদুলিল্লাহ উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট। উভয় লেনদেনের উদ্দেশ্যের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। লেনদেনের উদ্দেশ্য যদি হয় রিবা তথা লাভ তাহলে তা অসৎ কৌশল; এটি শর‘ঈ পরিত্রাণের উপায় নয়।

এতে (তাওয়াররুকে) ঋণদাতা ব্যাংক ও ঋণগ্রহীতা লেনদেনের একটি নির্দিষ্ট উপাদানের ওপর এ মর্মে একমত হয় যে, উভয় লেনদেনকারী সুদে জড়িত না হওয়ার নিয়্যতে শর‘ঈ চুক্তির ন্যায় চুক্তিবদ্ধ হবে। এ ধরণের লেনদেনে অর্থনীতি, সমাজ ও আচার-আচরণে সুদের ধ্বংসাত্মক কুফল স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, যেমনিভাবে সরাসরি সুদী লেনদেনে অথবা লাভের বিনিময়ে ব্যাংক লোনে পাওয়া যায়। অতএব, আধুনিক ব্যাংক যাকে ‘তাওয়াররুক’ নামে অভিহিত করেছে, এ ধরণের লেনদেনে লেনদেনকারীর নিয়্যত ও সুদ হারামের শর‘ঈ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করলে এর অসৎকৌশল স্পষ্ট হয়ে যায়।

পঞ্চদশ অসিয়্যত: দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর অসিয়্যত

১- ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মিনায় কুরবানীর দিনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত বিদায় হজের ভাষণ উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ».

“এখানে উপস্থিত ব্যক্তি (আমার এ বাণী) যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়; কারণ উপস্থিত ব্যক্তি হয়ত এমন এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবে, যে এ বাণীকে তার থেকে বেশি মুখস্থ রাখতে পারবে”।[1]

২- ইমাম বুখারী রহ. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিনে মানুষের মাঝে খুৎবায় দিয়েছেন। তিনি এ খুৎবা উল্লেখ করেছেন, এতে রয়েছে,

ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ، فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ.

“অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা উঁচু করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি আমার দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি আমার দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছি? ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ঐ সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার জীবন, নিশ্চয় এটি উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়্যত উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়”।[2]

৩- ইবন মাজাহ ও হাকেম রহ. জুবাইর ইবন মুত‘য়িম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম হাকেম সনদটিকে সহীহ বলেছেন, তিনি

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৭৯।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৩৯।

(বর্ণনাকারী) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার ‘খাইফ’ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বললেন,

«نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ».

“আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন যে আমার বক্তব্য শোনার পর তা প্রচার করলো (অপরের নিকট পৌঁছে দিল)। কেননা জ্ঞানের অনেক বাহক নিজেরাই জ্ঞানী নয়। জ্ঞানের এমন বাহকও আছে যে, তারা যাদের নিকট তা বয়ে নিয়ে যায় তারা তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী”।[1]

ভূমিকা:

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত ও নূর নিয়ে এসেছেন, যা দ্বারা তিনি দুনিয়া আলোকিত করেছেন। তার সুসংবাদের মধ্যে অন্যতম সুসংবাদ হলো তার আনিত এ আলো প্রত্যেক ঘরে প্রবেশ করবে; এমনকি স্থায়ী স্থাপনা কিংবা অস্থায়ী ঘর কোথাও এমন কোনো বাড়ি-ঘর পাওয়া যাবে না যেখানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে নি। এ মিশন বাস্তবায়নে মাধ্যম হিসেবে মুসলিমরা বিশ্বের দরবারে এ আলোর দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব নিজেরাই নিয়েছেন এবং তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন।

এ কারণেই দেখি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বড় সমাবেশে এ বিষয়ে গুরুত্বসহকারে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছেন, «لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ» অর্থাৎ তাঁর সাহাবীরা الغَائِبَ। অর্থাৎ যারা সাহাবীদের পরে আগমন করবে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বলেছেন,

«تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ».

[1] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৩১; মুসতাদরাক হাকেম, হাদীস নং ২৯৪।

"তোমরা আমার নিকট হতে শ্রবণ করো এবং লোকেরা তোমাদের নিকট হতে শ্রবণ করবে, আর যারা তোমাদের নিকট হতে শোনবে তাদের নিকট হতে অন্য লোকেরা শ্রবণ করবে"।[1]

এভাবে পালাক্রমে একদল অন্য দলের কাছে ঘোষণা করবে, এভাবে এ কল্যাণ সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে যাবে এবং এ নূর প্রসারিত হবে। পৃথিবীর বুকে এমন কোনো নারী-পুরুষ অবশিষ্ট থাকবে না যাদের কাছে এ কল্যাণ ও আলোর দাওয়াত পৌঁছে নি।

দাওয়াত ও প্রচারের অর্থ:

দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর এ অসিয়্যতের অর্থ অনুধাবনে অনেক মুসলিমই শরী'আত প্রণেতার (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) মূল উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করে থাকেন। এ কারণে দীনের এ আলো এখনো পৃথিবীর অনেক ঘরে পৌঁছে নি। শরী'আতে দাওয়াত পৌঁছানো মানে এ নয় যে, দা'ঈ হতে হলে আলেম বা মুফতি হতে হবে, যার কাছে শরী'আতের অধিকাংশ মাস'আলা জানা থাকবে। আসলে ব্যাপারটি একেবারেই এমন নয়। যায়েদ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসটি শুনুন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

«نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ».

"সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে হাদীস শুনেছে এবং তা অন্যের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছে। জ্ঞান বহনকারী অনেকেই তার চেয়ে বড় জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারে। আবার অনেক জ্ঞান বহনকারী ব্যক্তি নিজে প্রজ্ঞাবান নয়"।[2] এ হাদীসে

---

[1] ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৬২; মুসতাদরাক হাকেম, হাদীস নং ৩২৭।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৬৬০; তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৫৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৩০;

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিছু দা‘ঈ মূলত জ্ঞানীই নয়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের ঘটনা একটু চিন্তা করলেই বিষয়টা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেই নিজ সম্প্রদায়ের নিকট মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত এ নূরের দা‘ঈ ও সুসংবাবাদদাতা হিসেবে ফিরে গেছেন। অতএব, ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো ও লোকদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যদি বিজ্ঞ আলেম হওয়া জরুরী হতো তবে তারা ইসলাম গ্রহণ করেই তাদের স্বজাতির কাছে এ দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব নিতেন না।

দা‘ঈর শর্তাবলী:

পূর্বোল্লিখিত যায়েদ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হাদীস অনুসারে আমরা দা‘ঈর জন্য দু’টি শর্ত পাই। তাহলো:

প্রথম শর্ত: শরী‘আতের যে বিষয়ে দাওয়াত দিবে তা যথার্থভাবে মুখস্ত করা যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর মিথ্যারোপ করা না হয়। নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, এখানে শরী‘আতের সমস্ত বিধান মুখস্ত করা উদ্দেশ্য নয়; বরং দা‘ঈ যে বিষয়ে দাওয়াত দিবে শুধু সেটিই সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা।

দ্বিতীয় শর্ত: দা‘ঈ শরী‘আতের যা কিছু জেনেছে ও মুখস্ত করেছে তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অনুযায়ী অন্যের কাছে পৌঁছানোর আগ্রহ থাকা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً».

ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৬৮০।

“আমার কাছ থেকে একটি আয়াতও যদি তোমাদের কাছে পৌঁছে তা তোমরা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও”।[1]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত দো‘আর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রত্যাশা থাকা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ».

“সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে হাদীস শুনেছে এবং তা অন্যের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছে। জ্ঞান বহনকারী অনেকেই তার চেয়ে বড় জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারে। আবার অনেক জ্ঞান বহনকারী ব্যক্তি নিজে সূক্ষ্মজ্ঞানী নয়”।[2]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৬১।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৬৬০; তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৫৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৩০; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৬৮০।

শেষকথা:

উম্মতের সত্যিকারের উপকারী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ জীবনের অসিয়্যতসমূহ আলোচনার পরে আমরা আল্লাহর কাছে এ দো'আ করছি তিনি যেন এ উপদেশসমূহ থেকে আমাদেরকে উপকৃত করেন এবং যে ব্যক্তি এগুলো পড়বে বা শুনবে তাদের জন্য এগুলো উপদেশস্বরূপ কবুল করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বময় ক্ষমতাবান। আমরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করছি তিনি যেন আমাদের শেষ পরিণাম ভালো করেন এবং আমাদের শেষ পরিণতি যেন কল্যাণকর হয়। আমরা আরো আশা করি তিনি যেন সঠিকগুলো গ্রহণ ও ভুলগুলো প্রত্যাখ্যান করার তাওফিক দান করেন। আমাদের আলোচনায় যা কিছু সঠিক তা আল্লাহর তাওফীকেই হয়েছে, আর যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি সঙ্ঘটিত হয়েছে তা আমাদের ও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এসব ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র ও মুক্ত। আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাঁর কাছেই তাওবা করছি। পরিশেষে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ একটি অসিয়্যত উল্লেখ করছি। তাহলো জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মৃত্যুর তিন দিন আগে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

«لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ».

"তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর প্রতি নেক ধারণা পোষণ করা অবস্থায় মারা যায়"।[1]

পরিশেষে আমরা আপনাদেরকে আল্লাহর আমানতে সোপর্দ করলাম, যাঁর নিকট সোপর্দকৃত জিনিস ধ্বংস হয় না এবং আমাদের শেষ কথা হলো, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (সমস্ত প্রশংসা মহাবিশ্বের রব আল্লাহ তা'আলার)।

আল্লাহ সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাহাবীগণের ওপর। সমাপ্ত

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৭৭।